BY THE SAME AUTHOR.

SIVA & SAKTI.

True Hinduism for the first time explained,—An Elaborate Discourse on Hindu Religion and Mythology —their origin and interpretation in 2 Vols. 630 Pages Price Rs. 5 only.

BY THE SAME AUTHOR

THE HINDU SCIENCE OF MARRIAGE.

Culled from the various Sastras with Sanskrit texts in Devnagri character and their easy English translation.

IT TREATS OF

1. How to choose an auspicious wife,
2. How to get desirable children and so forth.

A wonderful & unique work, Price Rs. 1-8.

Sankaracharya His Life and Teachings to be shortly out. By the same author. Price Rs. 2-8

An Introduction to the Study of Hinduism (A Study of Comparative Religion) By MR. BIPIN CHANDRA PAL. Price Rs. 2/8..

IN BENGALI.

জেলের খাতা, বা কারাবাসে লিখিত ধর্ম্ম ও সমাজ তত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধাবলী—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। মূল্য ১৲

সৃষ্টি-রহস্য, or the Riddle of the Universe শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৲

SRISH CHANDRA GUPTA,

The Eastern Publishing Company
9-2, **Cornwallis Street, Calcutta.**

সৃষ্টি-রহস্য।

OR

THE RIDDLE OF THE UNIVERSE.

শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা।
৬৪।১, ৬৪।২ নং সুকিয়াষ্ট্রীট "লক্ষ্মীপ্রীণ্টিং" ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭।

ভূমিকা।

সৃষ্টি-রহস্যের প্রবন্ধগুলি প্রথমে "নায়ক" নামক সংবাদ পত্রে ইং ১৯০৯ সালের ১৭ই আগষ্ট হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৩০ সংখ্যায় বাহির হয়। এক্ষণে কতিপয় ভদ্র মহোদয়ের অনুরোধে উক্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বিষয়টি যেমন গভীর, তেমনি দুরূহ, সুতরাং এত সংক্ষেপে ইহার আলোচনা সম্ভবপর নহে। যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, ইহার এক একটী বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, এইরূপ কত পুস্তকই না লিখিতে হয়? যাহা হোক্ পরে আমার "বেদ কি" এবং "সনাতন ধর্ম্ম" নামক পুস্তকদ্বয়ে ইহার কোন কোন বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। উপস্থিত এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সাধারণে আদৃত হইলে আমার শ্রম সফল মনে করিব। ইতি

কালনা,
বর্দ্ধমান। — লেখিকা।

সূচী।

সৃষ্টি-রহস্য।

প্রথম অধ্যায়।

স্বাভাবিক অবস্থা।

প্রাথমিক ত্রিতত্ত্ব—

আত্মস্থ, আত্মজ্ঞ, আত্মানন্দ।

দৃশ্যতঃ সৃষ্টি চারিভাগে বিভক্ত, অব্যক্ত, ব্যক্ত, পূর্ণব্যক্ত ও লয়। কিন্তু মূলতঃ উহা দুই, অব্যক্ত ও ব্যক্ত। আবার অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের বিকাশ, অব্যক্তকে তাই ব্যক্তের কারণ বলা হয়। জাগতিক হিসাবে, যে বস্তুর যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহার নিবৃত্তিও তাহাতে হয়, এই নিয়ম অনুসারে, ব্যক্ততত্ত্ব (অর্থাৎ সমুদয় দৃশ্যতত্ত্ব) অবশেষে আবার সেই অব্যক্ততত্ত্বে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে। অনুসন্ধানচিকীর্ষু ব্যক্তিগণ অভিনিবেশ সহকারে সমুদায় সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অবশেষে একটীমাত্র তত্ত্বে গিয়া বিশ্রাম লাভ করেন। সে তত্ত্বটি সেই অব্যক্ত, অখণ্ড, অনন্ত, ব্রহ্মবস্তু। যিনি

স্ব স্বভাবে বা আত্মস্থ অবস্থায় মহামায়ায়, (অথবা স্বপ্রকৃতিতে) সংবেষ্টিত হইয়া নিরাকার নিরঞ্জনরূপে অব্যক্ততত্ত্বে (নিত্যকালে) অবস্থান করেন। কাল সমাগত হইলে, স্বভাবরূপিণী মহতী প্রকৃতি অন্তরঙ্গ পুরুষের অন্তরস্থ কামে ক্ষোভিতা হইয়া সেই প্রসুপ্ত (অথচ সৃষ্টি কাম যুত) পুরুষসিংহকে জাগরিতরূপ সক্রীয় অবস্থায় আনয়ন করিতে প্রয়াস পান। সেই চেষ্টারূপ সচেতন অবস্থাই জগৎ-বিকাশের প্রথম স্পন্দন বা পরম ব্রহ্মের জাগরিত অবস্থার প্রথম নিঃশ্বাস। উহাই, ব্যক্ত জগতের প্রথম ক্রন্দন 'অ'রূপ মহাশব্দ। নবস্তূত কামনার তীব্র বলে, ঐ 'অ' শব্দই, ক্রম-বিবর্দ্ধিত হইয়া 'উ' শব্দে বা গতিতে পরিণত হয়। ক্রমে সসীম অর্থাৎ কালনির্দ্দিষ্ট মহাকালে বাধিত হইয়া, উহাই 'ম' শব্দে পরিণত হইয়া মহাশব্দ 'ওঁ'কারে পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

ত্রিতত্ত্বই সৃষ্টির মহামন্ত্র; এই মহামন্ত্র অব্যক্তে অব্যক্তভাবে অবস্থিত। ব্রহ্ম যখন জগদতীত, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় জ্ঞান ও তর্কের অতীত, কাল ও দেশ ব্যবধান পরিশূন্য, একমাত্র অদ্বিতীয় নিত্য বোধে নির্ব্বিকার, তখনও এই ত্রিভাব তাহাতে বর্ত্তমান। যোগিগণ মহাসমাধি যোগে যখনই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মসাগরে নিমজ্জিত হন, তখন তাঁহারা নির্ব্বিকার সমুদ্রের মধ্যেও ত্রিভাব পরিলক্ষিত করিয়া থাকেন। ত্রিভাব তখন তাঁহার আত্মস্থ, আত্মজ্ঞ, ও আত্মতৃপ্ত বা আত্মানন্দে পরিসমাপ্ত।

আত্মস্থ অর্থাৎ 'আমি আছি' এই মহাজ্ঞান সেই নির্ব্বিকার সমুদ্রের প্রধান অস্তিত্ব। এই জ্ঞান বর্ত্তমান না থাকিলে,

নির্গুণবস্তু ভবিষ্যতে কর্ত্তাপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। তাই যখন কিছুই ছিল না; একমাত্র সৎ বস্তুতে সমুদয় পরিপূর্ণ ছিল, তখন এই দিব্যজ্ঞান বা নিত্য বোধ অথবা "আমি আছি" এই অনন্ত সত্ত্যমাত্র বর্ত্তমান ছিল। সেই অহংজ্ঞানের স্মৃতির উপরই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত। স্রষ্টার "আমি আছি" এই ভাবের উপরই আবার নব কল্প আবির্ভূত। স্মৃতি না থাকিলে অভুক্ত কর্ম্মফল কোথায় সঞ্চিত হইত? বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অন্তর্জগতের উপর নির্ভর করে। স্মৃতি অন্তঃকরণের প্রধানবৃত্তি। ভগবানের স্মৃতিপটে জগদতীত অবস্থায় নামরূপ-ভাবে বিশ্ব অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত ছিল। উহার অভাব হইলে, বিশ্বের অভাব হইত। জগতের অস্তিত্ব অন্তরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাই সেই জগদতীত ব্রহ্মে 'আমি আছি' এই পরম জ্ঞান, আত্মস্থনামে অভিহিত। বেদান্তদর্শনে এই আত্মস্থ বস্তুকে 'সৎ' নামে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। ইহাই সৃষ্টির অদ্বিতীয় মহাকারণ, অপর দুইটি অবস্থা, সেই এক মাত্র "একমেবাদ্বিতীয়ং" সৎবস্তুতেই প্রযোজ্য।

আত্মজ্ঞ অবস্থা অর্থাৎ আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ। যখন অনন্ত 'সৎ'এ সৃষ্টিকাম আবির্ভূত হয় নাই, অনন্ত তত্ত্ব সমুদায় একীভূত অবস্থায় অবস্থিত, এখন যে জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত, সৃষ্টাতীত অবস্থায় সেই জ্ঞান তখন একাধারে সংস্থাপিত। ব্রহ্মসত্তা বা একমাত্র 'সৎ' বস্তু তখন, আপনি আপনায় মুগ্ধ, স্তব্ধ, স্থিত, অবস্থিত।

আত্মানন্দ—অর্থাৎ, আপন আত্মায় তিনি আপনি আনন্দিত, তৃপ্ত, স্ফূর্ত্তিযুক্ত। আপনি আপনাতে রতি, মতি ও প্রীতিযুক্ত। তত্ত্ববিদ্‌গণ একমাত্র জগদতীত 'সৎ' বা অস্তিত্ববোধক বস্তুতে এই ত্রিভাব পরিদর্শন করিয়া থাকেন। যে ত্রিভাব অব্যক্ততত্ত্বে ব্যবস্থিত, তাহাই ব্যক্তে 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' নামে বা 'অ' 'উ' 'ম' তে পরিসমাপ্ত। তাই সৃষ্টির সমুদয় তত্ত্ব এই ত্রিতত্ত্বে ব্যবস্থিত।

ওঁকারের 'অ' শব্দে জগতের আদি অবস্থাকে বুঝায়; 'অ' হইতে প্রথমাবস্থার (অর্থাৎ জগদতীত) অখণ্ডিত কাল, খণ্ডিত হইয়া ক্রমশঃ ব্যক্তাভিমুখে আইসে, 'উ'তে আসিয়া উহা বিস্তৃতি লাভ করে, 'ম'তে সসীম প্রকৃতিতে আসিয়া বাধকতা প্রাপ্ত হইয়া, উহা সম্যক্ ষড়ৈশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া, ব্যক্ত জগতের উপযোগী হয়। "অ" "উ" "ম" অর্থাৎ শব্দ জ্যোতিগতিতে ও সমুদয় জগৎ বিকাশিত। তাই উহা, অর্থাৎ ঐ শব্দকে স্রষ্টার প্রথম নিঃশ্বাস বা জাগরণ চিহ্ন বলা যায়।

কর্ত্তার কামেই কর্ম্ম সম্পাদিত, স্রষ্টার ইচ্ছায় সৃষ্টি বিবর্দ্ধিত। একমাত্র পরম পুরুষের মহাকামেই সৃষ্টি বিকশিত। সেই কামেই তাঁহার স্বভাব-স্বরূপিণী মহামায়া ক্ষোভিতা। বিগত সৃষ্টির কর্ম্মফল তাহার উপলক্ষণ মাত্র। স্রষ্টা আপনায় আপনি কামযুক্ত না হইলে, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপে ক্ষোভিতা হইবেন? কিরূপেই বা তাহা সংকর্ষিত হইয়া তাহাতে বিগত জীবের কর্ম্মফল পরিস্ফুট হইবে? আপাততঃ সৃষ্টিতে বীজ ও ক্ষেত্র উভয়সংযোগ ব্যতীত জগতের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

অনেক দার্শনিক এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আশু দৃষ্টে এই ভ্রম অনিবার্য্য। কাজেই তাঁহারা প্রকৃতির ক্ষোভন (অর্থাৎ ইচ্ছা) ও বিগত জীবের কর্ম্মফলই সৃষ্টির প্রধানতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে, প্রথম বীজ ও ক্ষেত্র কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? যখন দেখা যাইতেছে, সৃষ্টাতীত অবস্থায় কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় অব্যক্ত "সৎ" বস্তু বর্ত্তমান ছিলেন। উহারই দুই অবস্থা, একটী অব্যক্ত ও অপরটি ব্যক্ত। যখন নিত্য 'সৎ'এ শক্তির বিকাশ হয়, (অর্থাৎ চিৎরূপ দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হয়), তখন উহা ব্যক্ত। যখন দ্বিতীয়ভাব বিকশিত না হয়, তখন উহা অব্যক্ত-ভাবাপন্ন। ঐ শক্তি, শক্তিমান বা 'চিৎ' 'সৎ' হইতে বিভিন্ন নহেন, উহার পৃথক অস্তিত্ব কিছুই নাই। কার্য্য দৃষ্টেই শক্তি অনুমিত হয়। অগ্নিতে দাহিকাশক্তি গুহ্যভাবে অবস্থান করে; দাহ্য বস্তুর সংযোগ হইলেই ঐ শক্তি বিকশিত হয়। ফল কথা কার্য্য অনুভুত না হইলে, তাহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কার্য্য কে অনুভব করে?

'সৎ' অর্থে অস্তিত্ব বা আছে। ঐ ভাব যখন 'আত্মস্থ' অব্যক্ত, তখন অননুভূত, যখন ব্যক্ত তখন অনুভব্য। এস্থলে অনুভব অর্থে প্রকাশ। কিন্তু অনুভবের বিষয় ব্যতীত কি অনুভব হইবে? তবে ঐ মূল কারণ হইতে, অথবা প্রথম কারণ হইতে প্রথম কার্য্য বা বিষয় যাহা প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশের মধ্যে কারণ ও কার্য্য অবশ্যই অবস্থান করে। কার্য্যরূপ

প্রকাশের নাম বিষয় বা ক্ষেত্র, আর জ্ঞানানুভব-কারীর নাম প্রকাশক বা ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহাতে বুঝা যায়, সেই 'একমেবা-দ্বিতীয়ং' নিত্য 'সৎ' (বা আমি আছি) ভাবের মধ্যে অনুভূতি-রূপ কর্ত্তা ও অনুভূত রূপ বিষয়শক্তি লুক্কায়িত আছে। ঐ বিষয়শক্তি হইতে প্রথমে যে কার্য্যের বা বিষয়ের বিকাশ হয়, ঐ বিকাশ অনুভূতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। যদি অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকিত, তবে কার্য্য বা বিষয়ের কখনই বিকাশ হইতে পারিত না। ঐ অনুভূতিই স্বয়ং অনুভবকারী জ্ঞান বা দ্রষ্টা, উহাই সাক্ষীপুরুষ, এবং ক্রিয়াকারী বিষয়শক্তিই প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতিই সতের ভাব, সে কারণ তাহার অপর নাম স্বভাব। সুতরাং সৃষ্টির কারণই স্রষ্টা, উহার ভাবই প্রকৃতি। সৃষ্টির মূল কারণে বা কর্ত্তায় সৃষ্টিকাম সমুদিত হইলে, তবে তাঁহার স্বভাবে তাহা প্রতিফলিত হয়। কার্য্য যখন কারণের উপর ব্যবস্থিত, তখন কারণের ভাবেই কার্য্য বিকশিত। ব্রহ্মরূপী একমাত্র আত্মজ্ঞান, বা 'সৎ' রূপী নিত্য 'আমি' তেই এই জগৎ রূপ কার্য্য ব্যবস্থিত।

ব্রহ্মবস্তু নিত্য, তিনিই সকল কার্য্যের অদ্বিতীয় মহাকারণ। তিনিই কার্য্যরূপে কর্ষিত হইয়া কালে ব্যবস্থিত হন।

স্রষ্টাই সৃষ্টির নিমিত্ত। তাঁহারই কামে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইয়া সৃষ্টির কার্য্যপদে বরিতা হন। পুরুষকে তাই জগৎ সৃষ্টির মুখ্য কারণ বলা হয়। প্রকৃতি চিরকাল উপাদানভূত মহাকারণ নামে বিখ্যাত। কারণে কার্য্য নিঃশেষিত। প্রকৃতি তাই পুরুষে শেষ।

ঋষিগণ, মায়ারূপিণী প্রকৃতিকে ধরিতে গিয়া অবশেষে সেই পুরুষকে ধরিয়াছেন। সেই জন্য প্রকৃতি অনির্ব্বচনীয়া নামে অভিহিতা। পুরুষই সৃষ্টির মহাকারণ, প্রকৃতি তাহার উপলক্ষ মাত্র। পুরুষের কামেই প্রকৃতি ক্ষোভিতা।

মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় কারণ ও কার্য্য অথবা আকর্ষণী ও বিকর্ষণী উভয় শক্তি যখন ধীরে ধীরে একত্র সম্মিলিত হইয়া যায়, তখন আবার সাম্যাবস্থা আসিতে থাকে। ব্যক্ত তত্ত্ব ক্রমশঃ অব্যক্তে বিলীন হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সৃষ্টির অভুক্ত কর্ম্মফল মনের সূক্ষ্মাংশ বা অবিনশ্বর স্মৃতিরূপে পরিণত হইয়া, বিকীরণশীল শব্দ জ্যোতি ও গতির সহিত খণ্ডকাল পরিহার করিয়া মহাকালে সম্মিলিত হয়। কালকুক্ষিগত কর্ম্মবীজ কালাধীশ্বর নিত্যকাল বা ব্রহ্মসত্তার অব্যক্ত মহান্ স্মৃতিতে অব্যক্ত ভাবে গ্রথিত হইয়া থাকে। কাল আগত অর্থাৎ উপযুক্ত সময় সমাগত হইলে, সেই মহতী স্মৃতিতে যখন কাম সমুত্থিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মৃতিগ্রথিত সূক্ষ্ম কর্ম্মফল বিকাশোন্মুখ অবস্থায় আগমন করে, তখন উহা বহির্বিকাশের জন্য বলসঞ্চয়ে বা আকর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। উহাই—আকর্ষণরূপ, অর্থাৎ ঐ প্রবৃত্তির নামই গতি বা পরম ব্রহ্মের প্রথম জাগরণ।

ব্রহ্মরূপী সৎবস্তুই সৃষ্টির প্রধান কারণ, সকল কারণের শেষ কারণ, সকল জ্ঞানের মহান্ কেন্দ্র, সকল নীতির শ্রেষ্ঠ উপদেশ, সকল অবস্থার চরমস্থিতি। দার্শনিক, দর্শনতত্ত্ব আলোচনা করিয়া শেষে সেই ব্রহ্মতত্ত্বের দুয়ারে গিয়া দণ্ডায়মান

হন। বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান রাজ্য আলোড়ন করিয়া চরমে সেই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানে উত্থিত হন। জ্ঞানী জ্ঞানকাণ্ডে ভ্রমণ করিয়া অন্তিমে সেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়হীন নিরাকার নিত্য চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হন। যোগী, অষ্টৈশ্বর্য্য পদদলিত করিয়া শেষে ধীরে ধীরে খণ্ডজ্ঞান পরিহার করিয়া, অবশেষে সেই অখণ্ড জ্ঞানে উপনীত হন। যিনি যে পথ ধরিয়াই বিশ্বরাজ্যে অবতরণ করুন, অবশেষে তাঁহাকে সেই বিশ্বাতীত বিশ্বনাথের সান্নিধ্যে উপনীত হইতে হয়। তবে, অবস্থাবিশেষে এক মুহূর্ত্তেই হউক, আর শত জন্মেই হউক, অবস্থার তারতম্যে ইহার বিশেষ বিশেষ পথ বর্ত্তমান আছে।

যিনি ব্যক্ত জগতের পথিক (অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে অবতরণ করিতেছেন), তাঁহাকে আপাততঃ কারণ ও কার্য্যতত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইবে। ব্যক্ত-অব্যক্তের বহির্দেশে, যিনি যত ব্যক্ততত্ত্বে পরিভ্রমণ করিবেন, তাঁহাকে তত অব্যক্তের বহির্ভাগে বিচরণ করিতে হইবে। মূল হইতে দূরে থাকিলেই অমূলে পড়িতে হয়। অমূল মূলের বহির্ভাগ বলিয়া, সাধারণতঃ সংসার এই দুইটী রাস্তার নাম নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন। যিনি গুণানুসারে অব্যক্ত কর্ত্তাকে না ধরিয়া, তাঁহার ব্যক্তকর্ম্মতত্ত্বে নিবিষ্টচিত্ত, তাঁহাকে সতত কর্ম্মের জটিল বন্ধনে পড়িতে হয়। ব্যক্ততত্ত্ব বা কর্ম্মমাত্রই বিভিন্ন, কর্ম্মের ভাবও বিভিন্ন। সুতরাং কর্ম্মতত্ত্বের জটিল সমস্যায় পড়িলে, আর কাহারও সহজে নিস্তারের উপায় থাকে না। আর যিনি কর্ম্মের বা কর্ম্মবন্ধনের ভিতর

কোন গতিকে একবার কর্ত্তার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন, মহাকর্ম্ম সমুত্থিত হইলেও আর কেহ তাঁহাকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না। কর্ম্মের ভিতরই কর্ত্তা অবস্থান করেন, কেবল কোন গতিকে একবার তাঁহাকে জানা লইয়া বিষয়। স্রষ্টাই সৃষ্টি। তত্ত্ববিদ্‌গণ মূলে ও অমূলে অর্থাৎ বিশ্বধাতায় ও বিশ্বে কোন প্রভেদ দর্শন করেন না। তাঁহারা জানেন, সৃষ্টির যে অংশই যিনি ধরুন, অবশেষে তাঁহাকে সেই স্রষ্টার সমীপেই আসিতে হইবে। তা' যত কালেই হউক। যিনি যে জনমে যতখানি কর্ত্তাসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সে জনমে তাঁহার ততখানি উন্নতি হইয়াছে। তাই সমদর্শীদিগের চক্ষে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিতে অথবা ব্যক্তে ও অব্যক্তে কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না।

যাহার যাহা মূল, তাহা ধরিয়াই তাহার তত্ত্বনির্ণয় করা উচিত। ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডের মূল, সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব ধরিয়াই সমুদয় জগৎতত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত।

নির্গুণ ব্রহ্ম সৃষ্টির অতীত। অবিকশিত অর্থাৎ সমভাবাপন্ন নিত্যকালের নিভৃত কোলে তিনি অপ্রকট অবস্থায় (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গুহ্যভাবে অবস্থিতি) করেন। সেই তত্ত্বাতীত অবস্থার তত্ত্বনির্ণয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

কি মুনি ঋষি, কি সাধু সন্ন্যাসী, কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, কেহই সেই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন। যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা, তিনি তাহা লইয়া সেই ব্রহ্মসাগরের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে, তিনি নিত্যকাল হইতে কর্ষিত হইয়া,

যখন মহাকাশে আসিয়া সৃষ্টির স্রষ্টাপদে বরিত হন, সেই অবস্থা হইতেই তাঁহার তত্ত্ব আলোচিত হওয়া কথঞ্চিৎ সাধ্য। সাধু মুনি ঋষিগণ সেই স্থান হইতেই স্রষ্টাতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। বাক্য ও মন যখন কখনও সেই নির্গুণ দরজা পার হইতে সমর্থ হয় না, যেখানে সৃষ্টির অতীত বিজ্ঞানঘন ব্রহ্মবস্তু নিবসতি করেন, সেখানে আকাশ পদবাচ্য অবকাশের সম্ভাবনা না থাকায়, বাক্যরূপ শব্দের প্রবেশ নিষেধ। তাই বাক্যের তথায় স্থান নাই। সে কারণ সেই নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মবস্তুর বর্ণনা করিতে কেহই সমর্থ হন না। সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে সেই ব্রহ্মসাগরের তত্ত্বরস পান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সকলেই সামর্থ্যানুসারে কৃতকার্য্য, অর্থাৎ যাঁহার যে টুকু শক্তি তিনি তদনুসারেই তাঁহাকে বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কেন না যেখানে অখণ্ড তত্ত্ব একত্রিত, সেখানে আবার প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করে কাহার সাধ্য? যিনি যে তত্ত্বের রসিক, সেই তত্ত্বের ভাবমাধুর্য্যে তিনি তথায় এতদূর উন্মত্ত হইয়া পড়েন যে, সেই ভাব পরিপাক করিতে তাঁহার কতকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা তিনি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতেই সমর্থ হন না। তবে সেই চতুর পুরুষের উপর যিনি চতুরালি করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ যাঁহার 'আত্মজ্ঞান' অধিকতর পরিস্ফুট, যিনি সেই ব্রহ্মসাগরের ভাবানন্দেও "সেই আমি" এই জ্ঞানহারা হন না, তিনিই কেবল এই অবস্থার কথঞ্চিৎ রসাস্বাদনে সমর্থ হন। তা ছাড়া অন্যান্যেরা সেই অনন্ত সাগরের অনন্ত তরঙ্গে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া তাহার

তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকেন এবং অবশেষে এতদূর পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া পড়েন, যে সেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্মৃতি মাত্রই তাঁহাদের স্মৃতিতে থাকে, প্রকাশরূপ কার্য্যে বড় একটা তাহা ব্যবহৃত হয় না। কাজেই তাঁহারা সমাহিত অবস্থা পরিহার করিলে পর, আর সেই অবস্থার কথা যথোপযুক্ত ভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না। হৃদয়ের ভাব হৃদয়েই থাকিয়া যায়। প্রকাশক্ষমতা অত্যল্প লোকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহা মহা সিদ্ধ মহর্ষি ও মানসপুত্রগণ যাঁহারা এক একটী জগত-সৃষ্টির সামর্থ্য ধারণ করেন, তাঁহারা উক্ত সমুদ্রের এক একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। তবে যাঁহারা স্বাভাবিক মানসপুত্র, স্বভাবের স্বাভাবিক জ্ঞানে যাঁহারা জ্ঞানবান, যাঁহারা জীবন থাকিতেও জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ যাঁহারা বর্ত্তমান জন্মে জীবিত থাকিয়া কেবল পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করেন মাত্র, নবকর্ম্মের নূতন ফলের জন্য, আর যিনি নববীজ রোপণ করেন না। যে সমুদয় কর্ম্ম তিনি এ জনমে সংসাধন করেন, তাহার ফল স্বাভাবিক জ্ঞানে দগ্ধ হইয়া যায়। আর তাহা হইতে নববৃক্ষের উদ্ভব হয় না। তাঁহারাই কেবল কোন বিষয়ে আত্মহারা হন না, তাঁহাদের জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া, জগদতীত জগদীশ্বরের তত্ত্ব তাঁহারাই কেবল কথঞ্চিৎ লৌকিক সংসারে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সাধক, (অর্থাৎ যাঁহাদের আত্মজ্ঞান সাধনসাপেক্ষ্য) তাঁহারা সমাহিত অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে অহং-জ্ঞানের শক্তি লাভ করিতে পারেন না। মহামতি ব্যাস-

দেব ও তৎপুত্র শুকদেব ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত স্থল; ব্যাসদেব আজন্মের সাধক, ব্যাসের জ্ঞানগরিমা সাধনসাপেক্ষ্য। তাই ব্যাসকে যখন যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তখনি তাঁহাকে তাহার জন্য তপস্যারূপ চিত্তসংযমের সাধন করিতে হইয়াছে। আর শুকদেব স্বাভাবিক জ্ঞানে জ্ঞানবান বলিয়া তাঁহাকে কোন বিষয়ের জন্যই কখনও চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। সর্ব্বদাই তাঁহার মন আত্মায় সংযুক্ত থাকিত, সে কারণ সততই তিনি যোগযুক্ত ছিলেন, সর্ব্বতত্ত্ব তাঁহার নিকট সশরীরে উপস্থিত হইত। কোন বিষয়ের জন্যই তাঁহাকে মন বা বুদ্ধির শরণাপন্ন হইতে হইত না।

যাহা হউক,ব্রহ্মের স্বাভাবিক অবস্থা জ্ঞান ও তর্কের অতীত। গুরুরূপী জ্ঞান, সক্রিয় অবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থা হইতে তিনি কাল কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সৃষ্টির স্রষ্টাপদে বরিত হন, সেই অবস্থা হইতে জ্ঞাতারূপী শিষ্যকে পরিহার করিয়া প্রত্যাগমন করেন। জগদতীত অবস্থা বিজ্ঞানঘন বলিয়া ফাঁক অবকাশশূন্য, সুতরাং যেখানে জ্ঞান ও জ্ঞাতার অভাব, সেখানে জ্ঞান ও জ্ঞাতার অস্তিত্ব অসম্ভব। সেখানে কেবল দেশ-কাল-ব্যবধান-বিরহিত, নিত্যকাল মাত্র ব্যবস্থিত। নিত্যকালে উপনীত হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অর্থৎ গুরু ও শিষ্য বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সমুদয় একাকার মহাসাম্যে বা নিত্যত্বে পরিণত হয়। যেখানে একমাত্র সৎবস্তু ছাড়া 'অসৎ' নিত্যকাল প্রত্যাখ্যাত, সেখানে ভাব ছাড়া বাক্যের অবকাশ কোথায়?

তর্ক যেখানে অগণিত তর্কের সমাবেশ দেখিয়া আপনার সূত্র হারাইয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। নিরুপণ যেখানে অনির্ণীত, অপরিচ্ছন্ন সাগরে পড়িয়া আপনার তত্ত্ব হারাইয়া বসিয়া থাকে। বিজ্ঞান যেখানে অনন্ত ঘন-বিজ্ঞান দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। দর্শন যেখানে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা-তত্ত্ব হারাইয়া চক্ষু থাকিতেও দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়। ফলকথা, অনুভূতি ব্যতীত আর কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুভূতিকেই ব্রহ্মসাগরের ভেলাস্বরূপ বলিয়া তাহাকেই অবলম্বন করিয়া, সেই অনন্ত সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু অনুভূতিরও একটী বিশেষ দোষ আছে, যাহাকে একদেশদর্শী বলা যায়। অর্থাৎ যখন সে যাহাকে লইয়া ভাসে, তখন তাহারই ভাবে সে এমনই আত্মস্থ হইয়া পড়ে, যে আপনার তত্ত্ব নিরুপণ করিতে যাইয়া, শেষে সে আপন তত্ত্বেই মুগ্ধ হইয়া যায়। তাই তত্ত্বদর্শী-গণ অনন্ত তত্ত্বসাগরে যখন নিমজ্জিত হন, তখন তাঁহাদের সাহায্যার্থে "আমি আছি" এই আত্মসত্ত্বকে নিয়োজিত করিয়া রাখেন। আত্মজ্ঞান ব্যতীত কাহারও সাধ্য নহে যে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরুপণ করে। ঘোরতর সমাধিকালে ঋষিগণ যে তত্ত্ব ধারণ করিয়া মৃতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে শত শত বৎসর একাসনে অবস্থান করেন, সমাধিভঙ্গে তাহার কিঞ্চদধিকও বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়েন না। এরূপ ঘটিবার কারণ কেবল সেই এক-দেশদর্শী অনুভূতির অত্যধিক প্রাবল্য। যাহা হউক সকলকেই সেই নির্জ্জন দরজা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কি

দর্শন, কি বিজ্ঞান, কাহারও সেই স্থানে পৌঁহছিতে সাধ্য নাই। তবে, যে অবস্থায় তিনি সৃষ্টি কামনা লইয়া কার্য্যমূর্ত্তিতে স্রষ্টাপদে বরিত হইয়া ত্রিমূর্ত্তিতে মহাকাশে দর্শন দান করেন, সেই অবস্থা হইতেই তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার তত্ত্ব জগৎসমক্ষে প্রচার করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জগতের প্রথম অবস্থা।

মৌলিক ত্রিতত্ত্ব—

সৎ-চিৎ-আনন্দ

বা

শব্দ-গতি-জ্যোতি।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনন্তজ্ঞানবিমণ্ডিত, নিত্যকালে প্রতিষ্ঠিত ঋষিগণ শাস্ত্রমুখে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় (অর্থাৎ যখন সৃষ্টির বিকাশ হয় নাই) কিছুই ছিল না, কেবল এক অবিকাশিত তমোময়, প্রত্যক্ষের অগোচরীভূত, লক্ষণ দ্বারা অনমুমেয়, জ্ঞান ও তর্কের অতীত, গাঢ় নিদ্রায় যেন সর্ব্বতোভাবে সমুদয় প্রসুপ্ত ছিল।

এই মহা তমসাচ্ছন্ন অবস্থাকে পণ্ডিতগণ মহাকাল স্বরূপ পরব্রহ্মের নিদ্রাবস্থা বা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ভাব কহেন। তৎপরে

যখন সেই অনন্ত বস্তুতে সৃষ্টিকাম উদিত হইল, তখন স্বয়ম্ভূ ভগবান সেই অবিকাশিত সাম্যভাবাপন্ন মহাকালে প্রকৃতবীর্য্য (অর্থাৎ সকামভাবে) হইয়া তমোনাশক জ্যোতীরূপে প্রকাশিত হইলেন। এই স্বয়ম্ভূ জ্যোতিতে সমুদয় সৃষ্টিকাম অন্তর্নিহিত থাকিলেও ইহা প্রাথমিক অবস্থায় স্নিগ্ধ।

হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, এই জগৎ-বিকাশক জ্যোতি প্রথম অবস্থায় মহাসাম্যময় অর্থাৎ একমাত্র। দ্বিতীয় বস্তু তখন তদভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও, তাহা তখন প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল। সৎ সৃষ্টির কারণ, অসৎ তাহার কার্য্যশক্তি। কারণ তখন কারণাবস্থায় ছিল, কার্য্যরূপে পরিণত হয় নাই। তাই এই প্রাথমিক জ্যোতিতে সমুদয় সৃষ্টিকাম আন্তর্নিহিত থাকিলেও, তাহা তখন সাম্যময়। এই সাম্যের ভিতরই বৈষম্যের আগমন, সেজন্য একদিক হইতে দেখিলে যেমন তাহাকে একটী বলিয়া বোধ হয়, তেমনি অপর দিক হইতে দেখিলে, তাহাতে তিনটি বস্তুই দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য সেই জগৎ-প্রকাশক একমাত্র আলোকেতেই গতিশক্তি বিশিষ্ট স্বভাবশক্তি অবস্থিতি করে।

'সৎ'রূপ একমাত্র আলোকের মধ্যেই অসৎরূপ গতিশক্তি বা উত্তাপ বিদ্যমান। প্রথমাবস্থায় 'সৎ' প্রধান বলিয়া ঐ উত্তাপের বহির্বিকাশ হয় না। কালক্রমে উহার বিকাশশক্তির প্রকাশ হওয়াতে, উহাতে উত্তাপ বা গতির আগমন হইয়াছিল। হিন্দু-শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই জ্যোতির বিকাশ প্রথমে বলা হইয়াছে।

জ্যোতিকে প্রথম স্থান—অর্থাৎ শব্দও গতির অগ্রে বলিলে বৈজ্ঞানিক মতবিরুদ্ধ হয়। ইহাতে অনেকে ঋষিদিগের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, সৃষ্টির অগ্রে জ্যোতির বিকাশে কোন অবৈজ্ঞানিক ভাব নাই। ঐ বিকশিত জ্যোতিই গতিশক্তি বিশিষ্ট, উহার মূলে শব্দ ও গতি বর্ত্তমান। এই শব্দকে শাস্ত্র বিগতকল্পের কর্ম্মফল কহেন, অর্থাৎ ঐ কর্ম্মফল হইতেই আকর্ষণী শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়। উহার স্পন্দনেই নির্গুণব্রহ্মসাগরে ইচ্ছার আবির্ভাব হয়। ঐ ইচ্ছাই জগতের উৎপত্তিসূচক গতি নামে প্রসিদ্ধ। মহাকাশে উদিত প্রথম জ্যোতিতে শব্দ ও গতি উভয়েই প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে। তবে, আলোকের গতি যেরূপ বিস্তৃত ও বিকীরণশীল, তাপ সেরূপ নহে, সে তাহার নির্দ্দিষ্ট আধারেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। এইজন্য উত্তাপ অপেক্ষা আলোকই প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু উহাতে উত্তাপ বর্ত্তমান না থাকিলে উহার স্থায়িত্ব কিরূপে সম্ভব হইবে? আবার ঐ উত্তাপের অগ্রে শব্দরূপ ক্রিয়া বিদ্যমান না থাকিলেও ঐ উত্তাপের স্থায়িত্ব অসম্ভব। তাই একমাত্র 'সৎ' হইতেই 'চিৎ' বা গতিশক্তির আগমন চিরপ্রসিদ্ধ। অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের বিকাশ, তাই অব্যক্ত ও ব্যক্ত এক। সেইজন্য 'সৎ' ই একমেবাদ্বিতীয়ং।

এক্ষণে কথা হইতেছে 'সৎ' রূপ অস্তিত্ববোধক সত্তাই জগতের একমাত্র মহাকারণ-একমেবাদ্বিতীয়ং পরম্ ব্রহ্ম। 'সৎ'কে যখন একমাত্র বলা যাইতেছে, তখন 'অসৎ' বলিয়া কিছুই বর্ত্তমান

থাকিতে পারে না। সমুদয়ই ঐ 'সৎ'তেএর ইচ্ছা মাত্র। এই ইচ্ছা বা 'অসৎ' 'সৎ'এর সত্তার উপরই প্রতিষ্ঠিত। স'তের ইচ্ছাতেই 'অসৎ'এর প্রাদুর্ভাব ; এবং অনিচ্ছায় তিরোভাব। সে কারণ, 'সৎ'কে এক মাত্র বলা হয়। অলৌকিকজ্ঞানে জ্ঞানবান্ মহামতি শঙ্করাচার্য্য একমাত্র ব্রহ্ম সত্তা ব্যতীত দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ সৃষ্টির একমাত্র কর্ত্তা ব্যতীত, দ্বিতীয়ের সম্ভাবনা অসম্ভব।

শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে বুঝা যায়, স্বয়ম্ভু ভগবান (অর্থাৎ স্বয়ং উদ্ভূত গুহ্য তেজোভাস) সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা নিত্যকালে গুহ্যভাবে বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাই স্বকৃত ইচ্ছায় বা বিগত সৃষ্টির উদীয়মান কর্ম্মফলে প্রকৃতবীর্য্য (অর্থাৎ সকাম বা গতিশক্তিরূপী) হইয়া মহাকাশে প্রথমে আলোক বা জ্যোতিরূপে দর্শনদান করিলেন।

শাস্ত্রে মহাকাশকে সমস্ত ভূতের আদি কারণ বলা হয়। ইহা হইতেই সমুদয় সৃষ্টির উপাদান সংগৃহীত হয়। নিত্যকালের বহিরঙ্গ মহাকাশ, আবার মহাকাশের বহির্বিকাশ খণ্ডাকাশ। কালকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ উপাদান কহেন। কাল কেন উপাদানভূত স্থুল কারণ হইলেন, কেন ঐ মহাকাশকে সমুদয় ভূতের আদি কারণ বলা হয় ? যখন দেখা যাইতেছে, সৃষ্টির অতীত মহান গুহ্য ব্রহ্মসত্তা নিত্যকালে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নিত্যকালই বর্ত্তমান অথবা তিনি স্ব স্বভাবে (সৃষ্টাতীত অবস্থায়) নিত্যকালই বর্ত্তমান। এই অবস্থায় তিনি অনন্তকাল একই ভাবে অবস্থান

করেন। কিন্তু যখন তিনি সৃষ্টিকাম হইয়া কাম্যমূর্ত্তিতে আপনাকে অংশতঃ স্বীকার করিয়া ব্যক্তপথ অবলম্বন করেন, তখন তাঁহাকে ত্রিমূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যক্ত পদে অর্থাৎ স্রষ্টাপদে তাঁহার ত্রিমূর্ত্তি অসম্ভাবি অর্থাৎ শব্দরূপ কামনার উদয় হইলেই চিৎরূপ ইচ্ছা বা গতি তাহাতে আগমন করিবে। আবার গতির আগম হইলেই তাহাতে জ্যোতির বিকাশ হইবে। তবে সমস্তই কালে কালে বা তালে তালে উপনীত হইবে। অকালে তালভঙ্গ করিয়া কেহই আগমন করে না। সমুদয়ই কালে কালে তালে তালে সম্পাদিত হয়। মহান সংসারের মহতী নীতি তাই সমুদয়ই তালে তালে। আমরা বাহ্য সংসারে সমুদয় তাই তালে তালে সম্পাদিন হইতে দেখি। কালে কালে রাত্রি আসে, আবার কালাগমে দিন আগমন করিয়া থাকে। কাল আগমনে নীলাকাশে তপনদেব উদিত হইয়া, প্রখর করধারে বিশাল সংসারকে আলোকিত করেন, আবার কাল আগত হইলে তিনি উদয়াচলে অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থান চন্দ্রদেবকে প্রদান করিয়া যান। কালে কালে তালে তালে জীব সংসারে আগমন করে, আবার কালাগমে সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। সমুদয় কালেই,—বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কালেই প্রতিষ্ঠিত, আবার কালেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কাল ছাড়া হইলে, সৃষ্টি কখনও সৃষ্টিপদে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সচরাচর শুনা যায়, ব্রহ্মবস্তু নিত্যকালে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনি চিরকালই আছেন,—কোন কালেই তাঁহার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই।

তাহা হইলে বলিতে হইবে, যাহাকে সচরাচর কাল বলা হয়, তাহা সেই ব্রহ্মবস্তু বা তাহার ভাববিশেষ। তিনি যখন নিষ্ক্রিয়,কালও তখন নিত্য ; আবার তিনি যখন অংশতঃ সক্রিয়, তখন নিত্যকাল খণ্ডকালে ব্যবস্থিত। ইহাতেই বলিতে হইবে, যিনি কাল, তিনিই ব্রহ্ম, যেমন দেহ ও দেহী, যিনি আধার তিনিই আধেয়। দেহ ও দেহীতে যেমন নিত্যসম্বন্ধ, তেমনি ব্রহ্ম ও কালে অকাট্য সম্বন্ধ। কাল তাঁহার আধার বা স্বভাব, তিনি কালের আধেয়।

তত্ত্ববিদ্‌গণ জগৎকে অবস্থত্রয়ে ব্যবস্থিত করেন,—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। জগতের স্থূল দেহ স্থূল উপাদানে বিনির্ম্মিত ; সূক্ষ্মজগতের সূক্ষ্ম শক্তি লইয়া সূক্ষ্ম দেহের সংগঠন ; আর কারণ জগতের কারণ সমষ্টি লইয়া কারণ দেহের বিকাশ। কারণ দেহের ত্রিদেহ, ত্রিজগতের সম্পত্তি ; যখন আত্মার কারণাবস্থা মহাকাল তাঁহার আধাররূপে কল্পিত। আত্মা, যখন সূক্ষ্ম তখন কারণ বা অর্দ্ধব্যক্ত, তখন তাঁহার আধার দ্রবীভূত সূক্ষ্মতত্ত্ব বা বিচ্ছিন্নকাল। আবার যখন তিনি স্থূল, তখন তাঁহার আধার স্থূল বা খণ্ডকালে পরিণত।

এক্ষণে কথা হইতেছে, যে বস্তু নিরালম্ব (অর্থাৎ অন্যের অবলম্বন শূন্য) তাহার আবার কালাবলম্বন কি ? কিন্তু যখন তাঁহাকে বলা হয়, তিনি নিত্যকাল বর্ত্তমান, তখন কালছাড়া কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ? তাই বলিতে হইবে কালেই তিনি বর্ত্তমান আছেন।

এ কথায় অনেকে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-বস্তুকে দ্বিত্ত দোষে দূষিত মনে করিতে পারেন। অনেক পণ্ডিত এই অবস্থায় সেই মত প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আবার কাহারও মতে পুরুষ উপলক্ষ মাত্র; প্রকৃতিরূপিণী মহা শক্তিই সৃষ্টির প্রধানতম কারণ। সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; কিন্তু বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথার কোন সত্যতা অনুভব করা যায় না। পুরুষই সৃষ্টির প্রধানতম কারণ, পুরুষ ব্যতীত প্রজাসৃষ্টি অসম্ভব। কি ব্যক্ত কি অব্যক্ত সমুদয় তত্ত্বেই পুরুষের কর্তৃত্ব প্রধান। অনেকে মাতৃশক্তিকে জগতের প্রথম কারণ বলিয়া বিবেচনা করিয়া পুংচিহ্ন অপেক্ষা স্ত্রী চিহ্নকে পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মত, কখনই সৃষ্টির চরমতত্ত্বে পৌছিতে পারে না। মহাকাল বা মহত্তত্ত্বে গিয়া তাঁহারা সমুদয় শূন্যাকার দর্শন করিয়া আবার অনেককে প্রকৃতি প্রধানমতে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে সকল মহাত্মা প্রকৃতি তত্ত্ব পরিহার করিয়া তাঁহার অন্তরস্থিত সেই মহান পুরুষে পঁহুছিয়াছেন, তাঁহারা কখনই প্রকৃতিকে পুরুষের সমকক্ষ কিংবা তদেতর স্থানেও বসাইতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা তত্ত্ব ধরিয়া পুরুষকেই জগতের স্রষ্টাপদে বরণ করিয়া প্রকৃতিকে তাঁহার ইচ্ছা, বাসনা, কামনা ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। পুরুষ তাঁহার বাসনাকে যে ভাবে পরিচালিত করিবেন, বাসনা সেই ভাবেই দর্শন দান করিবে, তাই শাস্ত্র কর্ত্তাগণ প্রকৃতিকে

পুরুষের নর্ত্তকী নাম প্রদান করিয়াছেন। নর্ত্তকীর নৃত্য-বিদ্যা পরের মনোরঞ্জনের জন্য। পরের রুচি অনুসারে তাহাকে কলা প্রদর্শন করিতে হয়। পর যখন যেরূপ অনুমতি করে, নর্ত্তকীকে সেই ভাবে নৃত্য করিতে হয়। প্রকৃতির অস্তিত্বও সেইরূপ। পুরুষের বাসনা যখন যে ভাবে অভিব্যক্ত হইবে, প্রকৃতও সেইভাবে দর্শন দান করিবে। মূলকথা কর্ত্তাই কর্ম্ম-রূপে অভিব্যক্ত, কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম্মের দ্বিতীয় অস্তিত্ব নাই। পুরুষই জগতের অদ্বিতীয় মহা কারণ, তাঁহারই ইচ্ছায় জগত অভিব্যক্ত। তাঁহার ইচ্ছায় প্রকৃতিকে চেতনবতী (অর্থাৎ সৎ হইতেই চিৎ বা শক্তির আবির্ভাব)। তাঁহারই আভাসে সমুদয় আভাময় বা জীবনযুক্ত। তাই সর্ব্বদর্শনের শেষ পর্য্যায় বেদান্ত দর্শনে প্রকৃতির প্রাধান্য অস্বীকৃত হইয়া একমাত্র পুরুষকেই এক-মেবাদ্বিতীয়ং বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সৃষ্টি প্রবর্ত্তন পুরুষ হইতে, পুরুষই সৃষ্টির মহাকারণ।

মহাকাশকে শাস্ত্রে মহাকাল বলা হয়। মহাকাল সমুদয় আকাশের মহাকাশ বা আদিকাল। কালই সৃষ্টির ব্যক্তের কারণ, অর্থাৎ কর্ত্তার ইচ্ছা কালেই উদ্ভব, কাল ব্যতীত সৃষ্টি ব্যক্ত হইতে পারে না। তাই তত্ত্ববিদ্‌গণ মহাকাশকে সমুদয় আকাশরূপী কারণের আদি উপাদান কারণ কহিয়াছেন। কিন্তু কাল আকাশরূপী অবকাশযুক্ত শব্দ তন্মাত্রের জন্মভূমি হই-লেও, প্রথমাবস্থায় যখন ব্রহ্মবস্তু "একোহমং বহুস্যাম" এই ভাবে ভাবান্বিত হইয়া বিকীরণশীল হন নাই, তখন মহাকাশও

আকাশরূপ অবকাশ বা খণ্ডকালে পরিণত হইতে পারেন নাই। অবকাশ ব্যতীত আকাশ শব্দ প্রয়োগ অসম্ভব। যখন মহাকাশ অনন্ত, অসীম, এক অদ্বিতীয় ব্যবধান রহিত, তখন উহা আকাশ পদবাচ্য হওয়া অসম্ভব। তবে উহাই সকল কারণের আদি কারণ। উহাতেই গুহ্যতেজ সংকর্ষিত (বা পরমাত্মা জীবাত্মারূপে খণ্ডিত) হইয়া প্রথমে গতিরূপে শব্দায়মান। উহাই অর্থাৎ ঐ গুহ্যতেজের সংকর্ষণ জনিত শব্দই মহাশব্দ ওঁকার বা অ-উ-ম নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মহাকাল অবকাশ-যুক্ত, অর্থাৎ কর্ষিত না হয়, ততক্ষণ উহাতে গতি উৎপন্ন না হওয়াতে শব্দের সম্যক্ বিকাশ হইতে পারে না। শাস্ত্র ওঁ শব্দকে শব্দব্রহ্ম কহেন। ঐ শব্দই মহাপ্রলয়ে মহাভূতের তাণ্ডব নৃত্যের সহিত ইতস্ততঃ বিকীরণশীল গতি ও জ্যোতিতে মিশিয়া মহাকালের বক্ষে লুকায়িত হয়, বা খণ্ডকাল মহাকালে বা জীবাত্মা পরমাত্মারূপে পরিণত হয়। কিন্তু সম্মিলিত হইয়া, একত্র বহুকাল অবস্থান করিলেও, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, অর্থাৎ সেই আমি এই ভাবের ক্ষয় হয় না, বরং যতই খণ্ডকাল, মহাকালের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় ততই উহার আমি ভাব বা অহংজ্ঞান অধিক পরিস্ফুট হয়।

যখন সৃষ্টির কাল পূর্ণ হয়, তখন উহার অসৎরূপ বৈসম্য-শক্তি (বা সংকর্ষণ), অথবা উত্তাপ বা কামনা ধীরে ধীরে সর্ব্বাধার হইতে বিচ্যুত হইয়া সমভাবাপন্ন হইতে থাকে; কাজেই মহাভূতের ছিন্ন পঞ্চভূত বা মহাকালের পরিচ্ছন্ন

খণ্ডকাল, দ্রুত স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে হইতে ক্রমশঃ মহাকাশে একীভূত হইয়া যায়, এবং পরকল্পের কর্ম্মফলের বিকাশকাল পর্য্যন্ত উহাতে বিশ্রাম লাভ করে। কাল আগত হইলে, যখন বিগত সৃষ্টির অভুক্ত কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য পরমাত্মা জীবাত্মারূপে কালে সংকর্ষিত হইতে থাকেন, তখন তাহারই ভোগলালসায় প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইয়া উঠাতেই, আবার উহা হইতে সেই শব্দের প্রথম শব্দ 'অ' শব্দ উৎপন্ন হয়। ক্রমশঃ কামনা যত বহির্মুখী পথ অবলম্বন করে, ততই ঐ শব্দ দ্রুতগতির সহিত চালিত হইতে হইতে উহার আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণাধিক্যে গতির হ্রাস বশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া উহাই 'উ' শব্দে বিবর্দ্ধিত হয়। পরে উহাই মহাভূত কর্তৃক বাধিত হইয়া বা নীতি রাজ্যের ব্যবস্থায় ব্যবস্থিত হইয়া 'ম' শব্দ উৎপন্ন পূর্ব্বক মহাশব্দ ওঁকারে পরিণত হয়।

ওঁকার রূপ শব্দে ব্রহ্মের চারি অবস্থা বিকশিত। অকার বলিলে কারণাব্ধিশায়ী অর্থাৎ মহাকালস্থিত অব্যক্ত মায়িক প্রথম পুরুষকে বুঝায়। 'উ'কারে গতি বিশিষ্ট, সংকর্ষণ শক্তি বা দ্বিতীয় পুরুষকে বুঝায়, আর 'ম' কারেতে তৃতীয় পুরুষকে বুঝাইয়া থাকে, ও উপরিস্থিত মাত্রায় সৃষ্টাতীত নির্গুণ তত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করে।

ওঁকার একটী অনাদি সনাতন শব্দ মাত্র; যাহা সৃষ্টির বর্ত্ত-মান ও অতীতে চিরনিবদ্ধ। তাহার যে অংশ যুগে যুগে যুগধর্ম্মে ব্যবস্থিত তাহাই বাক্য নামে প্রসিদ্ধ। এই বাক্যই শব্দ-ব্রহ্ম নামে

কথিত। আর তাহার যে ভাগ অব্যক্ত নিত্যকালে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অপৌরুষের, অনাদি অনন্ত সনাতন ব্রহ্ম নামে কথিত। নির্গুণই সগুণ, অপৌরুষেয়ই পৌরুষেয়, পরমাত্মাই জীবাত্মা, ব্রহ্মই জগৎ, সৎই চিৎ, শব্দই-জ্যোতিতে পরিণত, সুতরাং আদি ও অনাদিতে কোন ভেদাভেদ নাই। যখন একমাত্র ব্রহ্ম-বস্তুই অদ্বিতীয়, তখন অসীম ও সসীমে প্রভেদ কোথায়?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ওঁকাররূপ মহাবাক্যে সৃষ্টির চারি অবস্থা অভিব্যক্ত। যে অবস্থা যেরূপ শব্দ, গতি ও জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়, তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া ঋষিগণ বাক্যকে চারি-ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। প্রথমে পরা, দ্বিতীয়ে পশ্যন্তি, তৃতীয়ে মধ্যমা, চতুর্থে বৈখরি।

স্থূল জগৎ যে উপাদানে গঠিত, ইহার সপ্ত তত্ত্ব যে ব্যব-স্থায় ব্যবস্থিত, তাহার সমুদয় লইয়াই মনুষ্য দেহ বিনির্ম্মিত। মানব ব্যক্ত জগতের অধিবাসী,সৃষ্টির চতুর্থাবস্থার সম্পত্তি। এতা-বৎ অপর ত্রিজগতে যে শব্দ ধ্বনিরূপে ধ্বনিত হইতেছিল, মনুষ্য জগতে তাহাই ধ্বনিরূপ পরিহার করিয়া বাক্যরূপে অভিব্যক্ত। সুতরাং মনুষ্য কর্তৃক বর্ণ সংযোগে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া উহাকে শব্দ রাজ্যের চতুর্থাবস্থা বা বৈখরিবাক্ বলা হয়।

যে শব্দ শুদ্ধ স্বাভাবিক বায়ুতে ধ্বনিত হয়, যাহা সূক্ষ্ম জগতের সম্পত্তি। যাহার স্থূলাংশ শ্বাস, প্রশ্বাসরূপে জীব দেহের জীবিত লক্ষণ, তাহাকে মধ্যমাবাক্ বলা হয়।

মহাকাশে প্রথমোৎপন্ন 'ওঁ' শব্দ বৈখরি বা মধ্যমা এ দুই বাক্য কখন হইতে পারে না। অবকাশ ব্যতীত পশ্যন্তি বাক্যেরও স্ফুরণ অসম্ভব,কেন না আকাশের স্বভাবতঃ গতিকেই ঋষিগণ পশ্যন্তি বাক্ কহেন। কিন্তু যখন মহাকাশ অবকাশ-হীন, শব্দ তন্মাত্রের আদি কারণ হইলেও উহা যখন অবকাশ-শূন্য, তখন ওই মহাকাশস্থিত মহাশব্দকেই পরাবাক্ বলা উচিত। অবকাশ ব্যতীত যখন শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব, তখন ওই একাকার মহা সাম্যে দৃশ্যতঃ অবকাশ না থাকিলেও উহাই যে, শব্দের জন্মভূমি তাহা নিশ্চয় এবং উহার অন্তর্গর্ণই যে মহাশব্দ তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

অন্তরস্থ গুহ্যতেজের সহিত মহাকালের প্রথম সঙ্কর্ষণে 'অ' শব্দ উৎপন্ন। ঐ "অ" শব্দতেই জগতের প্রথম অবস্থা অভিব্যক্ত, স্বয়ং উদ্ভূত প্রাথমিক জ্যোতির অন্তরস্থ মহা কামের সহিত উহার বিকাশ। ঐ মহাকাম যতই মহান স্মৃতিশক্তি কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই উহা গতিতে পরিণত হয়, ঐ বিবর্দ্ধিত গতিই "উ" শব্দে শব্দায়মান। কালক্রমে উহা হইতেই জ্যোতির বিকাশ হয়। গুহ্য তেজের সহিত মহাভূতের যতই আভ্যন্তরীণ সংকর্ষণ উপনীত হয়, ততই উহার বাহ্যগতি মন্দীভূত হইতে হইতে উহার আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উহা সরলভাবে চালিত হইতে না পারিয়া, ক্রমশঃ বক্রাকার বা কুণ্ডলিত সর্পের কুণ্ডলের আকার ধারণ করে। অতি দ্রুত গতিই শেষে অনন্-

ভূত গতিতে পরিণত হয়। এক খণ্ড রশ্মি হস্তে লইয়া বিঘূর্ণিত করিলে যেমন সেই বিঘূর্ণিত রশ্মির অতিশয় ঘূর্ণন বশতঃ উহার গতির পরিমান স্থির করা যায় না, বরং অনেকটা স্থির বলিয়া অনুমান করা হয়, সেইরূপ এই দ্বিতীয়াবস্থার অতি দ্রুত ঘর্ষণই শেষে অনুভূতির বহির্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়, অর্থাৎ কোন বস্তু যখন অতি দ্রুত গতিতে চালিত হইতে থাকে, তখন উহার গতি নির্ণয় করা অসম্ভব হয়।

এই তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে হইলে, বলিতে হইবে পূর্ব্বোক্ত মহাকাশে গুহ্যতড়িৎ বর্ত্তমান আছে। উহার স্বাভাবিক ক্রিয়াই শব্দ—উহাই ক্রমশঃ গতিতে পরিণত, এবং উহার (ক্রিয়ার) ফলই জ্যোতি। প্রথম উদ্ভূত জ্যোতি যাহাকে শাস্ত্র জগৎ বিকাশের প্রথম কারণ কহেন, তাহার ভিতরে এই দুইটি তত্ত্ব অবশ্যই বসতি করে। নতুবা জ্যোতির বিকাশ অসম্ভব। তবে আলোর গতি যেরূপ বিস্তৃত, তাপের গতি সেরূপ বিস্তৃত নহে বলিয়া, তাপ অপেক্ষা আলোকই প্রথমে দৃষ্ট হয়। ঘর্ষণ বা ক্রিয়ার বৃদ্ধি হইলে, আভ্যন্তরীণ গতির দ্রুততার হ্রাস হয়। যতক্ষণ গতি অস্বাভাবিক দ্রততায় পরিচালিত হয়, ততক্ষণ উহার অভ্যন্তর দ্রবীভূত থাকে বলিয়া, ক্রিয়ার সম্যক বিকাশ হয় না। ক্রমশঃ গতির হ্রাস ও ঘর্ষণের আধিক্য হেতু, মহাকাশস্থ গুহ্যতড়িতের তেজোভাস জ্যোতিবিশিষ্ট হইয়া উর্দ্ধে বিকীরিত হয়। ঐ জ্যোতিতে অরূপ ও স্বরূপ উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। শব্দ ও গতির কোন আকার নাই।

জ্যোতির কতকটা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন আশ্রয়-ভূত পদার্থ ব্যতীত ঐ জ্যোতির সম্যকরূপের বিকাশ হইতে পারে না। মহাকাশ-রূপ আশ্রয়ে ঐ জ্যোতির বিকাশ মাত্র হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে উপরিউক্ত গুহ্য-জ্যোতিতে শব্দ গতি ও জ্যোতি বিদ্যমান আছে। উহাই প্রথম ত্রিতত্ত্ব। হিন্দু শাস্ত্রে এই শব্দগতি ও জ্যোতি বিমণ্ডিত তেজোভাসকে জগৎ-কারণ ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হয়। ঐ শব্দ গতি ও জ্যোতি, ত্রিতত্ত্বই ওঁকাররূপ মহামন্ত্রের প্রধান কারণ। ওঁ কারে জগতের ব্যক্ত ত্রি অবস্থা ও উহার উর্দ্ধ মাত্রায় সৃষ্টাতীত অবস্থা পরিজ্ঞাপন করে।

এক্ষণে কথা হইতেছে নিগুর্ণতত্ত্ব একমাত্র একমেবা-দ্বিতীয়, একটী মাত্র বস্তুতে প্রতিভাত। তবে সক্রিয় ব্রহ্মে বা ব্যক্ত জগতে এই ত্রিভাব কোথা হইতে প্রসূত হইল? যাহা মূলে নাই তাহাই ত মিথ্যা বা অসৎ নামে পরিকল্পিত। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ যখন মিথ্যা 'অসৎ' বা অকারণ বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডে কোন তত্ত্ব সন্দর্শন করেন না, তখন বলিতে হইবে যাহা আমরা ব্যক্ত জগতে 'অসৎ' বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা ওই 'সৎ' বস্তুরই ভাব বিশেষ। জগতের মূল যখন এক এবং সেই এককেই যখন সমুদয় বলা হয়, তখন ঐ একেতেই 'সৎ' ও 'অসৎ' উভয় তত্ত্ব বর্ত্তমান। জ্ঞানময় ঋষিগণ তাই "সর্ব্বব্রহ্মময়ং জগৎ" এই মহান তত্ত্ব সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিগণ কহেন, নির্গুণেই সগুণ, একমাত্র ব্রহ্মেই ত্রিতত্ত্ব বর্ত্তমান। একই বস্তুকে এক দিক হইতে (অর্থাৎ জগদতীত) দেখিলে যেমন একটী বলিয়া বোধ হয়, আবার অপর দিক (অর্থাৎ সৃষ্টকাল) হইতে দেখিলে তাহাকে তিনটী বলিয়া অনুমান হয়।

ব্রহ্ম নির্গুণ,—একমাত্র, তাহাতে ত্রিগুণ কিরূপে তিষ্ঠিতে পারে? যেখানে একমাত্র 'সৎ' ব্যতীত 'অসৎ' নিত্যকাল প্রত্যাখ্যাত, যেখানে দেশ ও কাল ব্যবধান নাই, যেখানে অহম্ এতৎ এই একটী মাত্র বস্তু ব্যতীত দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব নাই, সেখানে ত্রিগুণের অস্তিত্ব কোথায়? সেখানে 'অহম্' এতৎ নঃ এই প্রত্যাখ্যান কিরূপে তিষ্ঠিতে পারে? দ্বিতীয় প্রত্যাখ্যাত বস্তু কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হইল? দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলে প্রত্যাখ্যান কাহাকে লইয়া হইবে? তাহা হইলে বলিতে, হইবে এই নিত্য প্রত্যাখ্যানের ভিতর স্বীকার বা গ্রহণ নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই নিত্য প্রত্যাখ্যানের ভিতর কিরূপে স্বীকার ও গ্রহণ বসতি করে। শাস্ত্র বলিয়া থাকেন সেই একমাত্র 'সৎ' বস্তুর একদিক হইতে দেখিলে যেমম তাহাকে একটী মাত্র প্রতীয়মান হয়, অপর দিক হইতে দেখিলে তেমনি তাহাতে তিনটী বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হয়। তখন সহজেই বুঝা যায় যে, সেই একেতেই ত্রিতত্ত্ব কিরূপে বিরাজ করে।

মূল প্রকৃতি বা মহাকালে আত্মা সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে যথা,—

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাম্ ।
অজো হ্যকো জুষমানোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

পুরুষ আসক্ত হইয়া প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিতেছেন এবং ভোগ শেষ হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পৃথক হইতেছেন। প্রকৃতি আত্মার সম্মুখে আবির্ভূতা হন, আত্মা তাঁহাকে দেখেন ও জানেন এবং ক্রমশঃ তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া অনুরাগ বশতঃ তাঁহাকে 'অহম্ এতৎ' বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং ভোগ শেষ হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পৃথক হন। ইহা হইতে আত্মার তিনটী গুণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। প্রথম—জানা বা দেখারূপ জ্ঞান। দ্বিতীয়—স্বীকার ও প্রত্যাখ্যানরূপ ক্রিয়া। তৃতীয়, অনুরাগ বা বিরাগ রূপ ইচ্ছা। ইহাই প্রথম অবস্থায়, অর্থাৎ যখন নির্গুণ জগদতীত ব্রহ্মনিত্যকালে "আমিরূপ" বোধে বর্ত্তমান, তখন এই ত্রিতত্ত্ব আত্মজ্ঞ (অর্থাৎ জানা বা জ্ঞান), আত্মতৃপ্ত (অর্থাৎ আপনাতে আপনি ব্যক্ত অথবা আপন ভাবে আপনি ভোর), আত্মানন্দ (অর্থাৎ আপনরূপে আপনার মোহ বা আনন্দ) নামে পরিকল্পিত।

যখন নিত্যকালে, নিত্যব্রহ্ম, নিত্যভাবে বর্ত্তমান, যখন

তিনি ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুর বিদ্যমানতা নাই। তখন তাঁহার জ্ঞান, কোন জ্ঞাতব্য বিষয় ধরিয়া আর বিবর্দ্ধিত হইবে? সুতরাং সেই অবস্থায় তাঁহার সেই নিত্য "আমি" জ্ঞান, তাহার "আমিতেই" পরিব্যক্ত।

সেইরূপ যখন, সেই একমাত্র বস্তু ব্যপ্য ও ব্যাপক, উভয়-পদে বর্ত্তমান, তখন তিনি আর কাহাকে লইয়া পরিতৃপ্ত হইবেন?

পরের রূপ দর্শন করিলেই সচরাচর সংসারে মোহ আগমন করে, কিন্তু যখন তিনি ছাড়া দ্বিতীয়ের সম্ভাবনা অসম্ভব, তখন তিনি আর কাহার রূপে আনন্দ লাভ করিবেন? কাজেই তখন নিজের রূপে নিজেই বিভোর। কিন্তু অনেকে হয় ত এই কথার উপর প্রশ্ন করিতে পারেন, নিরাকার বস্তুর আবার রূপ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাই তিনি নিজ রূপে আনন্দলাভ করিবেন? এই কথার উত্তর প্রদান করিতে হইলে বলিতে হইবে, সসীম্ বা আকার বিশিষ্টের রূপ যেরূপ, তাঁহার দেহতত্ত্বের অনুরূপ; অর্থাৎ সে যে অবস্থায় যেরূপ ভাবে দর্শন দান করে, তাহার রূপ সেইরূপ ভাবেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আর অসীমের যাহাকে রূপ বলা যায়, তাহা তাহার অসীমের অনুরূপ অর্থাৎ অনন্ত। নির্গুণ তত্ত্বের যাহা অনন্ত তত্ত্ব তাহারই ভাব জগতের এক একটী ভাবরূপ বলিয়া কথিত। ইহারই একটী ভাবের একটী কণায় ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ। যে ভাব পরবর্ত্তী অব-স্থায়, অর্থাৎ জগতের প্রথম অবস্থায় জ্যোতিরূপে পরিকল্পিত,

তাহাই তাঁহার প্রথম রূপ বলিয়া স্বীকৃত। তাই ঋষিগণ সেই একই বস্তুতে সর্ব্বাবস্থায়ই ত্রিতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়াছেন, কি নির্গুণে, কি সগুণে!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একমাত্র বস্তুতেই ত্রিতত্ত্ব বর্ত্তমান। সমাধিমগ্ন ঋষিগণ অবিচ্ছিন্ন সমাধিযোগে একবস্তুতেই দুইভাব দর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম যখন নিগুর্ণ একমাত্র, অবিকাশিত তমোময় নিত্যকালে প্রতিষ্ঠিত, যখন নিত্য বোধ ব্যতীত আর কিছুই বোধগম্য হয় না, তখন সেই পরিপূরিত মহা মহিমায় সূক্ষ্ম বস্তুতে এই ত্রিতত্ত্ব আত্মজ্ঞ আত্মস্থ ও আত্মানন্দ নামে অভিব্যক্ত। প্রথমাবস্থায়, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মবস্তু কাল কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মহাকাশে জ্যোতিরূপে প্রথমে বিকশিত হন, তখন এই ত্রিতত্ত্ব সৎচিৎ আনন্দ, নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়াবস্থায় যখন ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত, তখন ইহা সত্ত্ব রজঃ তমঃ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তৃতীয়াবস্থায় যখন আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নামধেয় অগ্নি ও সোম স্ত্রী ও পুরুষ আকারে জগৎ রচনায় প্রবৃত্ত, তখন ইহা কারণ কার্য্য ও আধার নামে অভিহিত। চতুর্থাবস্থায় যখন চরাচর সমুদয় ব্যক্ত তত্ত্বের তত্ত্বাবলীর শেষ পর্য্যায়ে অধিরোহণ করিয়া আবার আপন স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য নিবৃত্তি মার্গে পদার্পণ করে, তখন এই ত্রিতত্ত্ব সত্ত্বা শক্তি ও বস্তুনামে খ্যাত।

"আমি আছি" এই নিত্যবোধে জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মের সৎরূপ অস্তিত্ব, বোধক জ্ঞানে তাই নিত্য জগৎ কল্পিত হয়।

এই জ্ঞানে বর্ত্তমান না থাকিলে সৃষ্টিকাম কোথায় সমদ্ভূত হইত, কোথায় বিগত সৃষ্টির অভুক্ত কর্ম্মফল সঞ্চিত হইত? যতই কল্প, কল্পের কর্ম্মফল তাহাতে সন্নিবিষ্ট হয়, ততই তাঁহার 'আমি মাত্র আমি' এই নিত্যজ্ঞান নিত্যজগতে পরিব্যক্ত হয়। ইহাকেই শাস্ত্র "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" কহেন, অর্থাৎ বোধরূপ নিত্যজ্ঞানে তিনি নিত্য তপস্বী। এই জ্ঞানে তিনি আত্মজ্ঞ আত্মস্থ ও আত্মতৃপ্ত, নির্গুণ অবস্থায় এই ত্রিতত্ত্ব তাঁহার নিত্য অনুসঙ্গী। সতেই অসৎ বর্ত্তমান। গুহ্যতেজেই শব্দ ও তাপের নিবাস। কালক্রমে ঐ তাপ ক্রিয়াশীল হইলে, উহা বিকীরিত হইয়া খণ্ডাকারে পরিণত হয়। উহাকেই শাস্ত্র "একোহং বহু স্যামঃ" কহেন, অর্থাৎ একা আমি আমার মত বহু হউক। যে বস্তু প্রথমে একমাত্র অদ্বিতীয়, তাহাই কাল সহকারে বহুতে বিভক্ত।

শাস্ত্রোক্ত এই ব্যাখ্যাটী বৈজ্ঞানিক মতে বুঝিতে হইলে বলিতে হইবে, জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে এক মাত্র গুহ্যতড়িৎ (ব্রহ্ম সত্তা) বর্ত্তমান ছিলেন। সেই বস্তুর অভ্যন্তরে তাপের (কামের) বিকাশ হইলে, তিনি প্রথমে চিন্তারূপ স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া, পরে গতি-শক্তি বিশিষ্ট হইয়া, আলোক বা জ্যোতিরূপে মহাকাশে দর্শন দান করিলেন। তাপ ব্যতীত আলোকের বিকাশ অসম্ভব, অর্থাৎ কাম ব্যতীত কর্ম্ম, কদাচ স্থায়ীত্ব লাভ করে না। তাই সেই স্রষ্টারূপ একমাত্র কেন্দ্রীভূত গুহ্য-জ্যোতিতে বা আলোকে উত্তাপরূপ কামনা গুহ্যভাবে অবস্থান

কারতেছিল। সেই তাপ (কামনা) কালক্রমে ঘনীভূত হইলে, তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিকীরিত হয়, ঐ বিকীরিত তড়িতই বহু অংশে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টিকে নানাভাগে বিভাগ করিয়াছে। উহাই জীবের জীবনীশক্তি, বা সমুদয় জগতের প্রাণ নামক মহাবল। বিজ্ঞান ঐ মহাবলকে তড়িৎ কহেন। যে সৃষ্টিতে যত কামনা সঞ্চিত, তাহার স্থিতিকালও তত অধিক, আর যে আধারে যত জীবনী শক্তি ঘনীভূত, তাহার কার্য্যকালও তত অধিক বিস্তৃত। তাই যে সৃষ্টিতে যেরূপ কামনার যেরূপ শব্দ মহাকাশে কর্ষিত হয়, তাহার স্থিতি কালও তত অধিক পরিমাণে পরিমিত হয়। সিদ্ধ মানস পুত্র যাঁহারা স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সহকারী পদে বরিত হন, তাঁহারা মহাকাল স্বরূপ মহান স্মৃতিকাগারে ওঁ কাররূপ মহাশব্দের বিস্তৃত শব্দ হইতে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির স্থিতিকাল নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। তাই ওঁ কারের অ" উ" ম" এই ত্রি বর্ণে সমুদয় জগৎতত্ত্ব নিহিত ;

এক্ষণে বুঝিত হইবে, সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় নিত্য তেজো-ভাস পূর্ব্বাপর নিত্যাকাশে অবস্থান করেন। ইহাই নিস্ক্রিয় তত্ত্বের স্ব স্বরূপ বা স্বাভাবিক অবস্থা। কালক্রমে ইহাতে সৃষ্টিকাম সমদ্ভূত হওয়ায় ইনি মায়া স্বরূপিণী মহামায়া কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে "অহম্ এতৎ" বলিয়া স্বীকার করেন। ঐ স্বীকারই ঘর্ষণ নামে প্রখ্যাত। উহার প্রথম ক্রিয়া শব্দ, দ্বিতীয় স্পর্শ বা গতি, তৃতীয় বিকীরণ। উহারই ফল আনন্দ বা রূপ। যে তেজ পূর্ব্বে একমাত্র সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থান করিতে-

ছিল, তাহাই তৃতীয়াবস্থায় বিকীরণশীল জ্যোতিতে পরিণত হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়া বহুতে পরিণত হইল। প্রথমে যে বস্তু একমাত্র ও স্নিগ্ধ, দ্বিতীয়ে উষ্ণ বা তাপযুক্ত, তৃতীয়ে তাহাই উৎক্ষিপ্ত।

তেজের কোন আকার নাই—উহাতে অরূপ ও স্বরূপ দুইই নিবাস করে। শব্দ ও গতির কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই, তেজের কতকটা রূপ আছে বটে; কিন্তু যতক্ষণ না উহা কোন অনুভব্য যোগ্য বস্তুর আশ্রয় লাভ করে, ততক্ষণ ঐ রূপের বিকাশ অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত গুহ্য তড়িতাভাসে শব্দ, গতি, ও জ্যোতি উৎপন্ন হয়। উহাই প্রথম ত্রিতত্ত্ব। বেদান্তে ঐ ত্রিতত্ত্বকে জগৎকারণ ঈশ্বর বলা হইয়াছে। যথা :—

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতমেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতঙ্গতঃ॥

অর্থাৎ চৈতন্যের আভাস, শক্তির সহিত মিলিত হইলে, ঐ শক্তি সংযোগ হেতু ব্রহ্মই ঈশ্বর পদবাচ্য হইয়া থাকেন। এ স্থলে যাহাকে চিচ্ছায়া বলা হয়, তাহাই গুহ্য তেজের (তড়িত) আভাস (ভর্গ), যে তড়িতের সহিত সাধারণতঃ মানব পরিচিত, এই গুহ্য তড়িত সেইরূপ ভৌতিক পদার্থাশ্রিত তড়িত নহে, ইহা অবিনশ্বর অদ্বিতীয় ব্রহ্মতেজ, ইহাতেই ত্রিশক্তি বর্ত্তমান। এস্থলে ব্রহ্ম বলিলে "সৎ" বস্তুকেই বুঝায়। জ্যোতি বলিলে ঈশ্বর বা শব্দ গতি ও জ্যোতি সমন্বিত ত্রিতত্ত্বকে বুঝায়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা জগতের বিকাশ, বর্দ্ধন, ও লয় হয়। প্রকৃত পক্ষে

মহাকাশে, অর্থাৎ মহাকালে শব্দ, গতি ও জ্যোতির বিকাশ হয়। অতএব ঐ স্থলে ত্রিতত্ত্ব অর্থে শব্দ গতি জ্যোতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্ত মহাকালের প্রথম বিকাশই ঐ প্রথম ত্রিতত্ত্ব, উহার প্রথম শব্দই (অ), ঐ 'অ' শব্দ গতির সহিত মিলিত হইলে উহাই 'উ'তে পরিণত হয়, এবং উহাই বাধকতা স্বরূপ 'ম' শব্দে বিকাশ লাভ করে। ঐ ওঁ শব্দের দ্বারা অন্তরস্থ জ্যোতির বিকাশ হওয়াতে উহাই কারণ জগতের ত্রিতত্ত্ব। এই ত্রিতত্ত্বই বৈজ্ঞানিকের শব্দ গতি ও জ্যোতি ও দার্শনিকের সৎ-চিৎ-আনন্দ নামে কথিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

জগতের দ্বিতীয়াবস্থা।

সত্ত্ব রজ তম।

প্রথম সৃষ্টির মহাকাশ (অর্থাৎ জগতের প্রথমাবস্থায়) যখন অন্তরস্থ গুহ্য জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হয়, তখন উহার অন্তরস্থ, উত্তাপের সম্যক বিকাশ হয় না। সেজন্য তখন সেই প্রথম উদ্ভাসিত জ্যোতি শীতল (অর্থাৎ সাম্য-ভাবেই) থাকে। যদিও ওই জ্যোতি "প্রবৃত্ত বীর্য্য" (অর্থাৎ গতিশক্তিবিশিষ্ট), তথাপি প্রথমাবস্থায় উহা স্নিগ্ধ বা সাম্য-ভাবাপন্ন। কেন না ওই সাম্যকে আশ্রয় করিয়াই যখন বৈসম্য-শক্তি (কামনা বা উত্তাপ) জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত, তখন ওই প্রথমোক্ত জ্যোতি স্নিগ্ধই হইবে। স্নিগ্ধরূপ সাম্যের আশ্রয়েই বৈসম্যরূপ প্রবাহ অবস্থিত। এই স্নিগ্ধরূপ সাম্যকেই অনন্ত স্থিতিশক্তি বলা হয়। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিকরী শক্তি জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত।

শাস্ত্র কহেন, মহাকাশস্থ প্রথম বিকশিত, গুহ্য তড়িতের আভ্যন্তরীণ অবিকাশিত উত্তাপের দ্বারায় ওই মহাকাশ যখন দ্রবত্বশক্তি প্রাপ্ত হয়, তখন উহা হইতে যে সূক্ষ্ম মহাদ্রাবক

উৎপন্ন হয়, উহাকেই বৈজ্ঞানিক ঋষিগণ সংকর্ষণ বলেন, অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ মহাকাশ, আর পুরুষরূপ গুহ্যতেজ উভয়ের সংকর্ষণ (মিলন) হইতে, উক্ত দ্রবত্ব সত্তার উদ্ভব বলিয়া, পুরাণে ইহাকে অনন্তদেব বা বসুদেবের পুত্র নামে অভিহিত করা হয়। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের মিলনজনিত সংকর্ষণে প্রকৃতিরূপী আধারশীল মহাকাশ দ্রবত্ব বা দ্রবীভূতা হইয়া একার্ণব হইয়া যায়। ঐ একার্ণবকেই শাস্ত্রে কারণবারি বলা হয়। মনু আদি স্মৃতিকারগণ এই দ্রবত্বধর্ম্মী একার্ণব মহাদ্রাবককে আপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধা প্রজাঃ। আপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ" বঙ্গার্থ যথা—সয়ম্ভূ স্বকীয় শরীর হইতে লোক সকল সৃষ্টির নিমিত্ত আদিতে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তি-বীজ অর্পণ করিলেন।

এই আপ বা আকর্ষণরূপ অনন্ত শয্যায়, গুহ্য জ্যোতিরূপ নারায়ণ শয়ন করিয়া থাকেন। শাস্ত্র ঐ আপকে তজ্জন্য অয়ন নাম প্রদান করিয়াছেন। ঐ অয়নরূপ নিত্য আপে যে গুহ্য-তেজরূপ মহাপুরুষ অবস্থান করেন, তাঁহাকেই নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়। পুরাণে যে ক্ষীরোদ সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় নারায়ণ শয়ান আছেন বলিয়া বর্ণিত আছে, তাহার ভিত্তি যে বিজ্ঞানে গ্রথিত, এক্ষণে তাহা বুঝা যাইতেছে। শয়ান অর্থে নিদ্রিত বা অবিকাশ, অর্থাৎ ঐ গুহ্য তেজ সংকর্ষণ বা আকর্ষণ ব্যতীত বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, সেজন্য উহাকে 'শয়ান' বলা হয়।

যখন জগতের আকর্ষণশক্তি শক্তিহীন হইতে থাকে, তখন ঐ ক্ষীরোদরূপ মহাকাশস্থ গুহ্য জ্যোতি আকর্ষণ অভাবে গুহ্যভাবেই অবস্থান করেন। সেই সময়েই জগৎ ধীরে ধীরে প্রলয়-মুখে ধাবিত হইয়া যায়। সম ও বিসম অর্থাৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ একীভূত হইয়া যাওয়াতে জগতের প্রাণ নামক মহাশক্তি ক্রমশঃ শক্তিশূন্য হইতে থাকে। সেই ঘোর বিপত্তিকালে জগৎকে আবার তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় স্থাপন করিবার জন্য, জগতের সহকারী স্রষ্টৃগণ অনেকসময়ে ক্ষীরোদরূপ মহাকাশের মহাকূলে একত্র হইয়া যোগরূপ ক্রিয়াকে চিত্তরূপ আধারে সন্নিবেশিত করিয়া, আকর্ষণ-রূপ ইচ্ছাশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া, জগতের সেই জীবনস্বরূপ গুহ্য-জ্যোতিকে বিকাশরূপ জাগরিত অবস্থায় আনিতে চেষ্টা করেন। পুরাণে এইরূপ আখ্যায়িকা ভূরি ভূরি বর্ণিত আছে। সকলের মূলেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত।

মহান্ আকর্ষণ বলে যতই মহাভূত দ্রবীভূত হইতে থাকে, ততই উহার অভ্যন্তরস্থ গুহ্য তেজোভাস জ্যোতিরূপে বিকীরিত হইয়া উঠে। অবশ্য শব্দ ও গতি উহার অভ্যন্তরে গুহ্যভাবে অবস্থান করে। তাপ তখন জ্যোতির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া উহার অভ্যন্তরে অবিকাশিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সে কারণ জ্যোতি তখন পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধভাবেই অবস্থান করে। ঐ স্নিগ্ধ, অর্থাৎ সমভাবাপন্ন সূক্ষ্ম জ্যোতি সেই একার্ণবভূত অনন্ত কারণসমুদ্রে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম মণ্ডলাকারে ঘনীভূত হইতে থাকে। ঐ মণ্ডলাকার স্নিগ্ধ জ্যোতিকেই শাস্ত্র ;"সহাস্রংশুসমপ্রভ হৈম

অণ্ড” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ সেই অসীম অনন্ত গুহ্য তোজোভাস মণ্ডলে মণ্ডলেই প্রতিভাত হয়, কারণ মণ্ডলাকার স্থানের মধ্যম কেন্দ্র হইতে উহার পরিধিরেখার সমস্ত স্থান বা বিন্দু সমান ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অপর আকারবিশিষ্ট বস্তুর ঐরূপ হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক মণ্ডলাকার বস্তুর যে স্থান হইতে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই স্থানই মধ্য-বিন্দু ও তাহার সকল দিকেই সমান দৃষ্টিগোচর হয়। সেই জন্য অসীম পদার্থ মাত্রই মণ্ডলাকার রূপে প্রতীয়মান হয়, অপর আকারের হয় না। আরও, যখন মহাকাশ সম্যক অবকাশবিশিষ্ট হইতে পারে নাই, তখন তাহাতে যে জ্যোতির বিকাশ বা জ্যোতি একীভূত হয়, তাহা যে মণ্ডলে মণ্ডলে বা ঘূরিয়া ঘুরিয়া বিকশিত হইবে, তাহাও অসম্ভব নহে।

ঐ মণ্ডলাকার জ্যোতিই সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্মের অণ্ডস্বরূপ। উহা হইতে জগৎরূপ শাবক প্রসূত হয়। যেরূপ স্থূল জগতে জরায়ুরূপ আধারে তাহার অভ্যন্তরস্থ ঔপাদানিক রসে অণ্ডবৎ জীবের সূক্ষ্ম আদর্শ ভাসমান থাকে, এবং ঐ সূক্ষ্ম আদর্শে তাবৎ অবয়বই সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত থাকে। কালসহকারে ঐ সূক্ষ্ম আদর্শ যতই তাহার আধারস্থিত রস আকর্ষণে সমর্থ হয়, ততই তাহার সূক্ষ্ম আদর্শ সকল ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। সেইরূপ জগৎ-রূপ শাবক মণ্ডলাকার জ্যোতির্ম্ময় একার্ণবে ভাসমান থাকায়, উহাকে শাস্ত্র ব্রহ্মাণ্ড বা অণ্ড আখ্যা দিয়াছেন। ঐ জ্যোতিতে তাপ অন্তর্নিহিত থাকিলেও তখন পর্য্যন্ত উহা স্নিগ্ধাবস্থায় ছিল,

অর্থাৎ তখনও ব্রহ্মাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সম ও বিসম দুই স্রোতে প্রবহমান হয় নাই, সেইজন্য তখনও উক্ত জ্যোতিকে "সহস্রাংশুসমপ্রভ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এস্থলেও শাস্ত্র জ্যোতিকেই তাপের অগ্রজাত, অর্থাৎ তাপ অপেক্ষা জ্যোতিকেই অগ্রবর্ত্তী বলিতেছেন। কিন্তু তাপ ব্যতীত জ্যোতির স্থায়িত্ব অসম্ভব, সেইজন্য উক্ত জ্যোতির মূলে যে তাপ বিদ্যমান আছে, তাহাও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু তথাপি তাপ তাহার নির্দ্দিষ্ট আধার ছাড়া কুত্রাপি অন্যত্র বিকীরিত হইতে পারে না। জ্যোতির গতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত ও বিকীরণশীল বলিয়া জ্যোতিই অগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়। হিন্দুশাস্ত্র সমুদয় জ্যোতির্ম্ময় বস্তুকেই অন্তর্নিহিত তাপযুক্ত বলিয়াছেন। এমন কি, এই পার্থিব গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য সমুদয় জ্যোতিবিমণ্ডিত বস্তুমাত্রকেই তাঁহারা সাম্যময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সাম্যময় জ্যোতি যখন তাহার বিপরীত বৈসম্যযুক্ত শক্তিদ্বারা আকর্ষিত হয়, তখনি উহার অভ্যন্তরস্থ গুহ্যতেজ বিকীরিত হইয়া উত্তাপরূপে পরিণত হয়। বিকশিত জগৎ, দুই প্রবাহে প্রবাহিত। এই দুই প্রবাহ তাহার সকল আধারে আধারোপযোগীরূপে বিদ্যমান। জগতের রীতি অনুসারে, দুই প্রবাহ কখন সমপরিমানে কোথাও একত্র থাকিতে পারে না। যে আধারে সমশক্তির (অর্থাৎ তাপ) আধিক্য, বৈসম্যশক্তি, (জল) তাহাতে ক্ষীণভাবে থাকিবে। আবার বৈসম্য-শক্তি, যথায়

প্রবলভাবে প্রবাহমান্, সমশক্তি সেখানে স্তিমিত ভাবে বর্ত্তমান হইবে। তবে দুই তত্ত্বই সর্ব্বত্র থাকা চাই। একের সম্পূর্ণ অভাব কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ঋষিগণ যে সমুদয় গ্রহ-নক্ষত্রে সমশক্তির প্রাধান্য দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের পুরুষ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, আর বিসমের প্রবলতায় তাহাকে স্ত্রী শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। আর যে আধারে দুই তত্ত্বই সমপরিমান, তাহাকে নপুংসক শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। পার্থিব সূর্য্যে তেজের প্রবলতা (অর্থাৎ তাহাতে সমশক্তির আধিক্য) এই জন্য এই সূর্য্য পুরুষ নামে অভিহিত। এই পুরুষরূপী সূর্য্যের আধারে উত্তাপ ঘনীভূত বা কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। আবার পৃথিবী বৈসম্যশক্তির আধিক্যে স্ত্রী-জাতীয়া। এই স্ত্রী-শক্তি যখন পুং-শক্তিতে যাইয়া সংঘর্ষিত হয়, তখন সেই সংঘর্ষণ হইতে, সূর্য্যের অভ্যন্তরস্থ তাপ, বিকীরিত হইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশকে উষ্ণ করে। উহা দ্বারা আবার পৃথিবী যেমন সূর্যের তাপ অপহরণ করে, সূর্য্য তেমনি পৃথিবী হইতে জল আকর্ষণ করিয়া, আপনার তেজশক্তির পরিপোষণ করিয়া থাকেন। সেজন্য পৃথিবীর যে স্থলে উক্ত বৈসম্যশক্তির অল্পতা দৃষ্টগোচর হয়, সে স্থলে সূর্য্য হইতে সম্যক তাপ আকর্ষিত হইতে না পারায়, তথায় নিদারুণ শৈত্য অনুভূত হইয়া থাকে।

সূর্য্য তাপের কেন্দ্র হইলেও, সূর্য্যর আপনা হইতে তাপ বিকীরণ করেন না। সেই জন্য সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী স্থান,

অর্থাৎ পৃথিবী হইতে উচ্চ, স্থির বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত শীতল। উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ ইত্যাদিও সে কারণে তুষারাচ্ছন্ন। এমন কি তথায় জীবজন্তু ইত্যাদি অনেক সময়ে শীতলতা প্রযুক্ত নিবাস করিতে পারে না। ইহা হইবার কারণ অনেকটা তাহাই, অর্থাৎ পর্ব্বতাদিতে সৌরাভাসের অভাব নাই, কিন্তু তথায় বৈসম্যশক্তির অল্পতা নিবন্ধন তাপ অনুভবে আইসে না। এই জন্য তথাকার বায়ু স্থির, অর্থাৎ বায়ু যে ত্রিতত্ত্ব লইয়া বহমান, তাহার দুই তত্ত্ব তথায় যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও, জলরূপ বৈসম্যশক্তির অল্পতায় উক্ত বায়ু তথায় সূক্ষ্ম ও স্থিরভাবাপন্ন। সেইজন্য পৃথিবীস্থ নিম্নভূমি অপেক্ষা উচ্চ ভূমিতে বায়ু ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও স্থির।

যখন জগৎ বিকশিত হয় নাই। একার্ণবীভূত কারণবারিতে সমুদয় একাকার, তখন সম ও বিসমশক্তি উভয়েই উক্ত একার্ণব মহাকারণের অন্তরে গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, তখন প্রথমোৎপন্ন জ্যোতিতে তাপ থাকিলেও তাহা স্নিগ্ধ। সম ও বিসম যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন উহা এক ভাবাপন্ন। এই অবস্থাকে শাস্ত্র মহামায়ার 'যোগনিদ্রা' বলে। ঐ সময় জগতের কোন ক্রিয়াশক্তিরই বিকাশ হয় না। পরে যখন অনির্বচনীয় কারণে আভ্যন্তরীণ গুহ্য তাপ দ্বারা কম্পন ও গতির বিকাশ হয়, তখন উক্ত 'যোগনিদ্রা' ভঙ্গ হয়। গতির বিকাশ হইলে; বিযৌগিক বা বৈসম্য তড়িৎ, যখন সম হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, তখনি জ্যোতির বিকাশ হয়। কিন্তু

উভয় তড়িৎ আবার যখন পুনঃ সংযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়, তখনি আভ্যন্তরীণ উষ্ণতার বিকাশ পায়।

ইহাতেই দেখা যায়, ঐ একার্ণবীভূত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মধ্যেই দুইটী ভাব প্রচ্ছন্ন আছে; একটী জ্যোতি, অপরটি একার্ণব কারণবারি। কিন্তু বাস্তবিক উহা একই পদার্থের দুই ভাব মাত্র। একই জ্যোতি হইতে, একার্ণবীভূত পদার্থের উৎপত্তি। একার্ণব উপাদানভূত মহাকারণ, সেজন্য তাহা দেহ বা আধার, আর তাহার অন্তর্নিহিত গুহ্য-তেজই দেহী। ঐ তেজের বিকাশই জ্যোতি, উহাতে তাপ অন্তর্নিহিত ভাবে অবস্থিত। উহাই একার্ণবীভূত উপাদান কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইলে, উহাদের পরস্পর ঘর্ষণ হইতে তাপের বিকাশ হয়। তাই প্রথমাবস্থার এক শক্তির প্রাধান্যে উক্ত জ্যোতি স্নিগ্ধ।

এই স্নিগ্ধতা বা শীতলতা হইতে আলোক ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া অবশেষে উষ্ণতার বীজরূপে পরিণত হয়। উহাই ঐ একার্ণব মহাকারণে শেষে ঘনীভূত হইয়া, তৈজস কেন্দ্র রূপে পরিণত হয়। ঐ ঘনীভূত তড়িৎকেই শাস্ত্র লোক-পিতামহ ব্রহ্মা নামে অভিহিত করেন। মনুসংহিতায় উক্ত তেজ সম্বন্ধে তাই কথিত আছে। যথা ঃ—

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥

বঙ্গার্থ যথা—যে জ্যোতি পূর্ব্বে মহাকাশের মহান দেহে অবস্থান করিতেছিল, সেই জ্যোতিই হৈম সূর্য্যের ন্যায় একটী

প্রভাবিশিষ্ট অণ্ডে পরিণত হইল। ঐ অণ্ডে স্বয়ং সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা সর্ব্বলোক-পিতামহ অর্থাৎ সম্যক তেজই জগতের পালনকর্ত্তা। এইজন্য তিনি জগতের পিতামহ।

সম্যক বা ঘনীভূত তেজই ব্রহ্মারূপী পিতামহ। ইহা হইতে যে দুই তত্ত্বের বিকাশ, তাহারাই ব্রহ্মার পুত্র, ও কন্যারূপে পরিচিত। ঐ দ্বিশক্তি হইতে জগতের সমুদয় আধার বিনির্ম্মিত। এই দুই শক্তিই স্ত্রী ও পুরুষ নামে পরিকল্পিত। বৈজ্ঞানিক মতে ইহাই সম ও বিসম নামে অভিহিত। ব্যক্ত সৃষ্টির অর্থাৎ ঐ ঘনীভূত, তড়িৎ কেন্দ্র হইতে, দ্বিপর্য্যায়েই জগতের যথার্থ প্রজা সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। তাই সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে সৃষ্ট প্রজা ত্রিপর্য্যায়ে উদ্ভব, সেজন্য ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয়।

স্বয়ং উদ্ভূত, গুহ্যজ্যোতি বা নিত্য তেজই জগতের পিতৃ-শক্তি, আর একার্ণবীভূত নিত্যজল বা কারণবারিই জগতের মাতৃশক্তি। ইহাদের উভয়ের সংকর্ষণ বা মিলন হইতে, কেন্দ্রী-ভূত মহত্তত্ত্বের উদ্ভব। মহত্তত্ত্বই উক্ত জ্যোতির তাপ, ঐ তাপই জ্যোতির ব্যক্তাবস্থা, উহাই ব্রহ্মের পুত্ররূপে পরিচিত। ঐ পুত্ররূপী ব্রহ্মা বা জীবন্ত জীবনী শক্তি হইতে সমস্ত জগজ্জাত জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকাশ হয়। ফল কথা, উহাই বিশ্বব্যাপী সজীবতার কারণ এবং সমস্ত বাহ্যজ্ঞানের পিতা মাতা স্বরূপ। তাপ হইতেই বিশ্বের ব্যক্তত্ব। কিন্তু তাহা বলিয়া উক্ত তাপে

স্বতঃই সৃষ্টি-শক্তি নাই। উহার জনক বা জননী স্বরূপিনী উপরিউক্ত তেজোময়ী শক্তিতেই যথার্থ সৃষ্টি-শক্তি বর্ত্তমান। উহাতেই ঐ তাপ সৃষ্টিকারী শক্তিবিশিষ্ট হয়। ঐ তাপরূপী বিশ্বের জীবনীশক্তি সতত ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবস্থান করিয়া, আপনার অসীম সর্ব্বশক্তি মন-শক্তির দ্বারা সত্ব রজ তমগুণে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বহু দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের নিত্য সৃষ্টি করেন। ইহাই জগতের জীবনদাতা রক্ষাকর্ত্তা ও সংহারক শক্তি। ইহার আদিকারণ হইতে নিত্য বহুদৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সৃষ্টি হইতেছে। মহত্তত্ত্ব বা কেন্দ্রীভূত তড়িৎই জ্ঞানবিকাশক, ক্রিয়োদ্দীপক, ও ভৌতিক আবরক, অর্থাৎ সত্ব, রজ, তম ত্রিগুণের কেন্দ্রবিশেষ। শাস্ত্র মহত্তত্ত্বের ত্রিভাবকে ত্রিবিধ অহংকার কহেন। বৈকারিক, তৈজস, ও তামস। তামস অহংকার হইতে ক্ষিত্যাদি মরুদ্ব্যোম্ স্থূল পঞ্চ-ভূতাত্মক সৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে। রাজস অহংকার হইতে প্রাণ-শক্তি বা ক্রিয়াশক্তির, আর সাত্বিক অহংকার হইতে মন বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। মূল কথা চৈতন্যরূপী সৎ বা তেজোভাস শক্তি চিৎ বা গতিতে প্রতিভাত হইয়া ত্রিগুণান্বিত হওয়ায়, উক্ত শক্তি সৃষ্টিসামর্থ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে দুই কারণ বর্ত্তমান, একটী নিমিত্ত ও অপরটী উপাদান। তামসিক মায়া হইতে জগতের উপাদান কারণ ও বিশুদ্ধ সাত্বিকী মায়া হইতে জগতের নিমিত্ত কারণ বিকশিত হয়। প্রথমাবস্থায় একার্ণবীভূত মহাকারণ জগতের উপাদান কারণ, উহাই সর্ব্বভূতের জননী স্বরূপা।

এবং আধ্যাত্মিক গুহ্যজ্যোতিই পিতৃশক্তি বা নিমিত্তকারণ। ঐ গুহ্যতেজের আভাস যুক্ত মহান কারণবারির অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণ হইতে বিরাট মন বুদ্ধির, রজোগুণ হইতে জাগতিক জীবনীশক্তির এবং তমোগুণ হইতে পঞ্চভূতের বিকাশ হয়। ঐ মনবুদ্ধিসম্পন্ন বিরাট বা প্রধান পুরুষরূপী তড়িৎকেন্দ্রই হিরণ্যগর্ভ বা লোকপিতামহ ব্রহ্মা। উহাই শাস্ত্রের সহস্রাংশু-সমপ্রভ হৈম-অণ্ডের আভ্যন্তরীণ কেন্দ্র। এবং ইহাই পুরাণের ব্রহ্মা, আর দর্শনের মহত্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের তড়িৎসমষ্টি। জগতের দ্বিতীয়াবস্থায় ব্রহ্মার বিকাশকাল। অব্যক্তের ব্যক্তত্বই ব্রহ্মার ব্রহ্মাত্ব। তাই শাস্ত্র কহেন, অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের বিকাশ বলিয়া ব্যক্তের প্রথম কার্য্য অব্যক্তকে জ্ঞাত হওয়া, এবং তাঁহার দ্বিতীয় কার্য্য ব্যক্তকে আরও ব্যক্ত করা। দ্বিতীয়া-বস্থায় দ্বিতীয়শক্তির তেজরূপী পরম ব্রহ্মই পিতৃস্বরূপ, আর একার্ণবীভূতা মহতী প্রকৃতিই উহার জননীস্বরূপা। ব্রহ্মের ব্রহ্ম-তেজই ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিভাসিত। উহাতেই ব্রহ্মার জন্ম। উক্ত অণ্ডের প্রকৃতিরূপী মহান্ আপই জননী-স্বরূপা। তাই ব্রহ্মা ব্রহ্মের পুত্র। ব্যক্ত প্রজাকুল হইতে তৃতীয় পর্য্যায়ে ব্রহ্মা বিদ্যমান বলিয়া ব্রহ্মা সর্ব্বভূতের পিতামহ আর প্রথমোক্ত নিত্য তেজই প্রপিতামহপদবাচ্য।

তত্ত্বদর্শিগণ কহেন, শব্দ হইতে জ্যোতি ও তেজের বিকাশ হয়। উহাই অর্থাৎ ঐ চিদ্বীজই যখন উক্ত একার্ণব সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন উহা হইতে সমুদয় জগতের সমুদয়

তত্ত্ব বিকশিত হয়। তাহা হইলে বুঝা যায়। মহৎপ্রকৃতিই বা কেন্দ্রশক্তিসমন্বিত উপাদান কারণই মহদ্ব্রহ্ম, উহাই ব্যক্ত জগতের কারণস্বরূপ, সেজন্য উহা যোনী বা কারণ নামে অভিহিত। আর তেজসমন্বিত চিদ্বীজপ্রদ শব্দই পিতাস্বরূপ।

শাস্ত্র কহেন, মহাপ্রলয়কালে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড যখন তাহার কারণে গিয়া বিরামলাভ করে, তখন একমাত্র সকল কারণের কারণ ব্রহ্মমাত্র অবশেষ থাকেন। এ অবস্থায় কারণ ও কার্য্য উভয়ে একীভূত হইয়া যাওয়াতে তখন কার্য্য হইতে কারণকে কোন মতে পৃথগ্‌ভূত করা যাইতে পারিত না। সেজন্য একত্ত্ব-ভাব প্রযুক্ত,তখন সমুদয় অন্ধকারময় ছিল। পরে লব্ধবৃত্ত হওয়ায়, অস্পষ্ট বল হেতু তাপের উদ্ভব হওয়াতে, অর্ণবরাশি উৎপন্ন হইয়াছিল। উহা হইতেই সাক্ষাৎ সৃষ্টিকরী শক্তি ব্রহ্মার বিকাশ হইলে, তাঁহা কর্ত্তৃক সমুদয় চরাচর জগৎ অবশেষে সৃষ্ট হয়।

মনুসংহিতায় এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে, যে ভগবান ব্রহ্মা, ব্রহ্মলোকের এক বৎসর সেই হৈমময় অণ্ডে নিবাস করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যান দ্বারা উহাতে সম্যক্ বিকশিত হইয়া,উক্ত অণ্ডকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া,উহার অর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদি লোক ও অধঃখণ্ডে পৃথিব্যাদি লোক সমূহ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং মধ্যভাগের মহা অবকাশে, অবকাশ রূপ আকাশ অষ্টদিক ও তন্মধ্যে নিত্য কারণ সমুদ্র সংস্থাপন করিলেন। এই সূক্ষ্ম আদর্শজগতই, তৃতীয়াবস্থার স্থূল ভৌতিক জগতের আদি উপাদান। এই জগৎকেই অবলম্বন করিয়া স্থূল জগৎ বিরাজিত।

এই শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মতে বুঝিতে হইলে বলিতে হইবে, পূর্ব্বের উক্ত একার্ণব-কারণবারিস্থিত ঘনীভূত তেজে সম্যক্ উত্তাপ সঞ্চিত হইলে উহা দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া যায়! ইহাই ব্যক্ত জগতের দুই প্রবাহ, সম ও বিষম। এই উভয়ের সংকর্ষণ হেতু ঐ ঘনীভূত তেজ বিকশিত ও বিকীরিত হইয়া যখন উৎক্ষিপ্ত হয়, তখন উহার যাহা সূক্ষ্মাংশ তাহাই তেজ-রূপে উর্দ্ধগামী হয়; আর যাহা উহার স্থূল বিভাগ, তাহাই শীতল ও কঠিন হইয়া নিম্নগামী হয়। উভয় তত্ত্ব উভয় দিকে প্রধাবিত হইলে, মধ্য ভাগ অবকাশ যুক্ত হইয়া পড়ে। ঐ অবকাশই স্থূল জগতে আকাশ নামে অভিহিত। মধ্যস্থলের অবকাশেই অষ্টদিক কল্পনা করা হয়, উহাতেই বায়ু নামে জগতের জীয়ন্ত জীবনীশক্তি, গতিরূপে প্রবাহিত হয়। বায়ুকে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ গতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ঐ গতি ত্রি-জগতের অবস্থানুসারে ত্রিতত্ত্বে বহমান। কারণ জগতে ইহার প্রধান অবলম্বন তেজ। সূক্ষ্ম জগতে ইহা গতি বা শক্তিরূপেই বর্ত্তমান। ইহাতে নিত্য আপ্ সম্মিলিত হইলে, ইহাতে নিম্ন জগ-তের বায়বীয় (স্নিগ্ধ গুণ যুক্ত) অর্ণবকণা নিপতিত হইলে ইহা জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়, এবং উহাতে কারণ জগতের তেজ-কণা মিলিত হইয়া, স্থূল জগতে ইহা বায়ু নামে পরিচিত হয়।

ঐ দ্বিধা বিভক্ত অণ্ড বা তড়িৎ-কেন্দ্র হইতেই ক্রমশঃ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতের বিকাশ হইয়া স্থূলজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।

ঐ দ্রবময় মহাভূতই শাস্ত্রের একার্ণবকারণবারি এবং উহার

অভ্যন্তরস্থ তেজোভাসই মহাবিষ্ণু। সেই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত তড়িৎ-তেজের যাহা স্থূল কেন্দ্র, তাহাকে শাস্ত্র উক্ত তেজের নাভি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতেই লোকপিতামহ ব্রহ্মার উদ্ভব। অনন্তব্যাপ্ত কারণবারি পরমাত্মার ইচ্ছাজাত তেজের আধার বলিয়া ঐ জলকে নারা নামে অভিহিত করা হয়। নারা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রথম প্রসূত বলিয়া অপত্য প্রত্যয়ে ঐ নারাস্থিত তেজকে অয়ন বলা হয়। তাই উক্ত তেজ নারায়ণ নামে কথিত।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহাকাশ অভ্যন্তরস্থ গুহ্যতেজে দ্রবত্ব শক্তি প্রাপ্ত হইলেই উহা অর্থাৎ ঐ দ্রবত্বধর্ম্মী বস্তু কারণ-বারি নামে কথিত হয়। পরমাত্মার ইচ্ছাজনিত সংকর্ষণ হইতে উহা প্রসূত বলিয়া ঐ দ্রবত্বধর্ম্মী বস্তুকে শাস্ত্র ব্রহ্মের অপত্যপদে বরণ করিয়াছেন। ঐ কর্ষিত কারণ বারিই তেজের আশ্রয় বলিয়া উক্ত জলকে নারা এবং উহা ব্রহ্মরূপী আত্মার সর্ব্ব প্রথম অয়ন বলিয়া উহাকে নারায়ণ বলা হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ একার্ণবীভূতা কারণবারিরূপ সমুদ্রপ্রবাহই আকাশীয় প্রবাহ, উহাই তেজরূপী বিষ্ণুর আশ্রয়। বট্ বলিলে এস্থলে কারণ সমুদ্রকেই বুঝায়, সুতরাং ঐ একার্ণব কারণ বারিই যে উক্ত বট্ তাহা নিঃসন্দেহ প্রতীত হয়, আর উহার প্রবাহই পত্র, উহাতেই তেজরূপী বিষ্ণুর নিবাস। এই জন্য শাস্ত্র বিষ্ণুকে বটপত্র-শায়ী বলিয়াছেন। ঐ অনন্ত সমুদ্রের যাহা কেন্দ্র তাহাই উক্ত তেজের নাভি। উহার মধ্যস্থ ঘনীভূত তেজই মহত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মা

নামে অভিহিত। পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর নাভিতে ব্রহ্মার জন্ম-বিবরণ যে বিজ্ঞানসম্মত, এক্ষণে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। বিষ্ণুকেই শাস্ত্র পুরুষ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, আর ঐ একার্ণব কারণবারিকেই জননী বা মহতী প্রকৃতি বলেন। আর উহার মধ্যস্থ ঘনীভূত তেজসমষ্টিই ব্রহ্মা। জগতের দ্বিতীয়াবস্থার ইহাই ত্রিতত্ত্ব। পুরাণাদি শাস্ত্রে এই ত্রিতত্ত্বকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবও বলা হয়। তেজই প্রধানতঃ বিষ্ণু, আর ঐ সংকর্ষিত শক্তিই শিব নামে কল্পিত, আর উহাঁদের মধ্যস্থ মহত্তত্ত্ব বা কেন্দ্রীভূত তড়িতই ব্রহ্মা। ঐ ঘনীভূত তড়িত হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবন বিকশিত। উহার বিদারিত অংশই পরিদৃশ্যমান স্থূলজগতের সূক্ষ্ম কারণ।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত। বিজ্ঞানের আকাশীয় প্রবাহই শাস্ত্রের কারণবারি। ইহাই উপরি উক্ত মহাকাশে প্রথম বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ খণ্ডাকাশে বিস্তৃত। আকাশের পর্য্যায়ক্রমে, এই কারণবারিও পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে বিভক্ত। জগতের প্রথম মহাকাশে যে কারণ মহাসূক্ষ্মও অব্যক্ত, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাহা অপেক্ষাকৃত ব্যক্ত ও স্থূল, তৃতীয়ে তাহাই আবার অপেক্ষাকৃত স্থূলরূপে প্রতিভাত। এই প্রথম কারণ মহাবিষ্ণুর অয়ন, ইহাতেই জগতের প্রথম পুরুষ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু শয়ন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বা যাহা উক্ত কারণবিস্তৃত তেজের ঘনীভূত বিভাগকেন্দ্র, তৎশায়ী পুরুষই ব্রহ্মা বা গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ নামে অভিহিত। তৃতীয়

পর্য্যায়ের কারণই তৃতীয় পুরুষ বিরাটের আশ্রয় ভূমি। সকল পর্য্যায়ের কারণ, তাহার কার্য্যাবস্থা হইতে সূক্ষ্ম। প্রতি পর্য্যায়ের কারণ তদধিকারস্থিত কার্য্যশক্তির মধ্যে অবস্থান করে, এবং তাহা হইতে সমুদয় কার্য্য তালে তালে বিকশিত হয়। ঐ দ্রবত্ব কারণ জাতীয় বস্তু প্রবাহে প্রবাহে বহমান বলিয়া শাস্ত্র উহাকে কারণবারি বলেন, আর বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে আকাশীয় প্রবাহ বলিয়া থাকেন। আকাশ সমুদয় উপাদানের আদি উপাদান বলিয়া উহাকে আদি কারণ বলা হয়। আর উহার মধ্যস্থ সত্তাধর্ম্মী বস্তুকেও সে কারণ, নিমিত্ত কারণ নামে অভিহিত করা হয়। উহা প্রবাহে প্রবাহে প্রবাহিত, (অর্থাৎ উপাদান মাত্রই শক্তিধর্ম্ম বিশিষ্ট বলিয়া সদাই অস্থির) তাই উহার নাম প্রবাহ, সে জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এই কারণ জাতীয় শক্তিধর্ম্মী বস্তুটিকে আকাশীয় প্রবাহ নাম দিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ইথরও এই শ্রেণীস্থ। ইহা তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত বলিয়া উহাও দ্রব বা বারিধর্ম্মী। উহা আকাশস্থিত তাবৎ বস্তুর মধ্যে প্রবহমান। ইথর সমুদয় গ্রহনক্ষত্রের বিকাশের আশ্রয় বলিয়া, উহাতে সমুদয় গ্রহাদি ওতঃপ্রোত ভাবে ভাসমান। সমুদয় স্থূল আধার যখন কালসমাগমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন উহার সূক্ষ্ম আদর্শ ঐ কারণরূপী ইথরে সূক্ষ্ম ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। স্থূল জগতে ইথরীয় প্রবাহ হইতে আমরা গতি জ্যোতি ও শব্দ উপলব্ধি করিয়া থাকি। এমন কি, দেখা যায় আকাশস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদিগণ শুদ্ধ মাধ্যাকর্ষণেই

পরস্পর পরস্পর আকর্ষণনিরত নহে,উহাদের ভিতর এমন একটী বস্তু আছে, যে যাহাকে আশ্রয় করিয়া উহারা স্বচ্ছন্দে সতত প্রবহমান হইয়া আপন আপন পদে স্থির থাকে। আকাশের অবস্থা অনুসারে সৃষ্টির পর্য্যায়ভেদে কারণবারিও পৃথক পর্য্যায়ে বিদ্যমান। খণ্ডাকাশস্থিত কারণ কখন মহাকাশের মহাকারণ হইতে পারে না। অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা যেমন পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে নামিয়া নামিয়া অবশেষে জীবরূপে পরিণত,কারণবারিও তেমনি পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে আসিয়া অবশেষে বাহ্যাকাশে স্থূল কারণবারিরূপে দেখা দেয়। এই কারণবারিস্থিত গুহ্য তড়িতের দুইটি প্রবাহ আছে, ইহাই সম ও বিসম বা যৌগিক ও বিযৌগিক নামে খ্যাত। ইহাদের কার্য্য, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও উৎক্ষেপন করা। এই আকর্ষণ ও উৎক্ষেপন হইতে ঐ আকাশবিস্তৃত কারণবারিতে চক্রাকার আবর্ত্ত সকল সতত সৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই নব নব গ্রহ নক্ষত্রের অব্যক্ত আধার। সকল চক্রেই দুই গতি,—বাম ও দক্ষিণ, তাই ইহাদের নাম বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত। ইহাদের কার্য্যাবস্থার প্রধান কার্য্য, দর্শন, স্পর্শন ও বিদূরণ। এই কার্য্যত্রয়ের দ্বারা ইহারা প্রতিনিয়ত অসংখ্য অসংখ্য আধার নির্ম্মাণে অগ্রসর। কিন্তু শুদ্ধ ইহাদের মিলনেই বস্তু উৎপন্ন হয় না। উহাদের আশ্রয়ভূমি কারণবারি-মধ্যস্থ গুহ্যজ্যোতিই সমুদয় বস্তুর উৎপত্তির কারণ। তাই যে চক্রে সম ও বিষম অথবা নিমিত্ত ও উপাদান কারণের সহিত উপরিউক্ত গুহ্যজ্যোতি সম্যক সংকর্ষিত না হন, তাহার সমুদায় ক্রিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়, অর্থাৎ

তাহাতে আর গ্রহ-নক্ষত্রাদি বা জীবের উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না। এজন্য আর্য্যবিজ্ঞানের মতে চতুর্থ তত্ত্ব ব্যতীত কাহারও উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। মূর্ত্তিধারী জীব হইতে উপরিউক্ত গুহজ্যোতি চতুর্থ পর্য্যায়ে নিবাস করেন, সেজন্য ঐ গুহতেজকে সচরাচর প্রপিতামহ বলা হয়। গীতায়, সৃষ্টির চতুর্থ পর্য্যায়স্থিত পরমপুরুষকেই প্রপিতামহ বলা হইয়াছে, ইহা সমধিক বিজ্ঞান-সম্মত। ব্রহ্মারূপী সমষ্টি তড়িতই হিন্দুশাস্ত্রের পিতামহ। হিন্দুর সমুদয় শাস্ত্রীয় ব্যাপারই গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে সংস্থাপিত।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ত্রিতত্ত্ব জগতের মূলে বিদ্যমান্ তাহাই সর্ব্বাধারে অভিব্যক্ত। এই ত্রিতত্ত্বকে শাস্ত্রীয় ভাষায় সূক্ষ্ম তৈজস তত্ত্ব, সূক্ষ্ম দ্রবীয় তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম পার্থিব তত্ত্ব বলা হয়। ইহাই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের মৌলিক্ ত্রিতত্ত্ব। ইহাকে অবলম্বন করিয়া স্থূল জগত নিয়ত স্বপদে প্রতিষ্ঠিত। মহাকালের মহান আধার যেমন জগদ্‌বিকাশের প্রথম স্থান, তেমনি জাগরণরূপ মহাগতি বা মহানিঃশ্বাসই ত্রিতত্ত্বের প্রথম কারণ। ইহাই ব্যক্ত সৃষ্টির পূর্ব্বাত্মিক অবস্থা, ইহা হইতেই স্থূল জগৎ ক্রমশঃ বিকশিত। যেমন স্থূলজগতের অগ্নি ও জলের সূক্ষ্ম কারণ আকাশ ও বায়ু, সেইরূপ সূক্ষ্ম মহৎ ত্রিতত্ত্বের কারণ উক্ত মহাকাশ ও মহাগতি। ব্রহ্মের জগৎ আলোচনারূপ ইচ্ছা বা আদেশ, শব্দব্রহ্মরূপ জগতের কারণ অবস্থা। আর সূক্ষ্ম দ্রবীভূত তৈজস মহদ্ব্রহ্মই জগতের সূক্ষ্ম অবস্থা। প্রত্যেক অবস্থাই ত্রি ত্রি তত্ত্বে বিভূষিত।

জগদ্বিকাশের পূর্ব্বাত্মিক মহান ও অব্যক্ত শব্দই ব্রহ্মা, মহাগতিই তাহার শক্তি ও পূর্ব্ববর্ণিত মহাজ্যোতিই তাঁহার পরম জ্ঞান বা আনন্দ স্বরূপ ত্রিতত্ত্ব বা ত্রিশক্তি। এই জ্যোতি-রূপ জ্ঞান হইতেই জগতের দ্বিতীয় অবস্থার মহামনরূপী মহত্ত-ত্ত্বের বিকাশ। গতিরূপ শক্তিই প্রকৃতি বা জননীস্বরূপা, জ্ঞানই পুরুষপদে বরণীয়, আর ইহাদের অর্থাৎ জ্ঞান ইচ্ছার সহযোগে মহত্তত্ত্বরূপ পুত্রের উৎপত্তি। এই মহত্তত্ত্বরূপী মহা-মনই এই প্রকৃতি ও পুরুষের পুত্রস্থানীয়। অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্বের বিকাশ, আর ব্যক্তকে বিকাশ করাই তাহার কার্য্য। কাজেই মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত সৃষ্টি ক্রমশঃ ব্যক্তাভিমুখে আইসে। ইহা হইতে ব্যবহারিক জগতের বুদ্ধিতত্ত্ব জৈবতত্ত্ব, ও ভৌতিকতত্ত্বের বিকাশ হয়। এই ত্রিতত্ত্বই শাস্ত্রের ত্রিবিধ অহংকার নামে কথিত। ইহার ত্রি অবস্থা হইতে এই বিশাল দৃশ্যমান জগতের অণু পরমাণু কীট পতঙ্গ হইতে সমুদয় প্রাণী পর্য্যায়ক্রমে বিকশিত। এই অহংকারই স্থূল অহংজ্ঞান নামে কথিত। যে যে ক্রমের জীব, সে সেই রূপ আমিরূপ অহং-কারের বশীভূত। এই ত্রিবিধ অহংকার হইতেই জগতের তৃতীয়া-বস্থার বিকাশ। ইহাই স্থূলজগতের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। কারণ মহত্তত্ত্বই ব্রহ্মা, তেজই বিষ্ণু ও সংকর্ষণ শক্তিই মহাদেব। যে হেতু শুনা যায়, মহাপ্রলয় সমাগত হইলে আকর্ষণী ও সংকর্ষণী এই উভয় শক্তি যখন একত্র হইয়া ধীরে ধীরে আপনার স্বাভা-বিক অবস্থায় অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় আসিতে থাকে, তখন সৃষ্টির

প্রাক্‌কালে গুহ্যতেজের অস্তিত্ব হেতু সংকর্ষণের বিকাশ হইলে, মহাকালের মহাসুষুপ্তি বা মহানিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং সম ও বিষম নামীয় দুইটি শক্তির বিকাশ হয়। সংকর্ষণ যখন ঐ মিলিত অবস্থা পৃথক করিয়া ফেলে, তখন ঐ পৃথক অবস্থাকে আকর্ষণ ও একাকারের ন্যায় অবস্থাপন্ন করিয়া আপনার কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া লয়। উক্ত ঘনীভূত তড়িৎ সমষ্টিই মহাকর্ষণ বা জগতের সৃষ্টিকারিশক্তি, তেজই বিশ্বের পালনা শক্তি, আর বিযুক্তশক্তিই সংহার-শক্তি। সংহার-শক্তি বিযুক্ত শক্তি হইলেও উহাই ক্রমবিকাশের মূলীভূত কারণ। সংকর্ষণ শক্তির দ্বারাই এক বস্তু, অপরে নিয়ত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়া ক্রমশঃ ক্রম-বিকাশে অধিরোহণ করে। যেমন ভূমি লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত হইলে, তথায় বীজ বপন করিয়া উত্তমোত্তম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি সংকর্ষণ শক্তির দ্বারা মহাভূত কর্ষিত হইলে, তাহাতে মহত্তত্বাদি বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই সংকর্ষণ শক্তিই পুরাণে বলরাম নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদ্বারা সৃষ্টি কর্ষিত হয় বলিয়া, বলরাম লাঙ্গলধারী।

জগতের দ্বিতীয়াবস্থার ত্রিশক্তিকে ভাবুকগণ সরস্বতী বীণা ও বাণী নাম প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মার অভ্যন্তরস্থ ব্রাহ্মী শক্তিকে সরস্বতী বলা হয়। ব্রহ্মা, ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টির প্রথম আদেশ বা প্রথম স্পন্দন বলিয়া ব্রহ্মা স্পন্দনাত্মক ব্যক্ত সৃষ্টির প্রথম প্রবর্ত্তক। ব্রহ্মা সমুদয় বিকশিত স্পন্দনের অধিপতি শক্তি বলিয়া ব্রহ্মা স্বরকর্ত্তা। ব্রহ্মারূপ মহামন, যখন যে স্পন্দন

তারে যেরূপ ঝংকার প্রদান করিয়া থাকেন, জগৎ সেই ঝং-কারের তালে তেমনি তালে তালে স্পন্দিত হইতে থাকে। মহত্তত্ব সমুদয় স্পন্দনের অধীশ্বর বলিয়া ব্রহ্মা ব্যক্ত জগতের ঈশ্বর। ব্রহ্মার সমষ্টি শক্তিই জগতের স্রষ্টাপদে বরণীয়। কাজেই সেই মহত্তত্ত্বের মহতী শক্তিই সরস্বতী। সৃষ্টির আদিতে স্রষ্টার মহাকাম প্রথম যে শব্দে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহারই সমুদয় তত্ত্ব, মহত্তত্ত্বে একীভূত। মহত্তত্ত্বরূপ মহাশব্দে সমুদয় ধ্বনি নিহিত; ধ্বনিই কালক্রমে বাণীতে পরিণত। জগতের প্রথম ত্রি-অবস্থায় এই ধ্বনি ক্রমশঃ ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততমে বিকশিত। চতুর্থাবস্থায় ইহাই আবার মানবজগতে বাণীতে পরিণত। ব্রহ্মা ধ্বনির অধী-শ্বর, ধ্বনি হইতে বাণীর বিকাশ। তাই সরস্বতী বাক্‌দেবী নামে প্রসিদ্ধ। সেজন্য সরস্বতী বীণা ও বাণীবিভূষিতা। বীণা ধ্বনি, আর বাণী বাক্য। স্পন্দন শক্তিতে এই দুই তত্ত্ব বর্ত্তমান। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের জ্ঞান ও ইচ্ছা সম্ভূত তেজোভাস হইতেই মহত্তত্ত্বের বিকাশ। ইচ্ছা প্রকৃতি ও জ্ঞানপুরুষ; এই উভয়ের ফল মহত্তত্ত্ব। তাই মহত্তত্ত্বে ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া ত্রিতত্ত্ব বহমান। ইচ্ছা ও জ্ঞান তাহার পিতামাতা স্বরূপ, ক্রিয়ারূপ শব্দই তাহাতে সম্যক বিকশিত। সুতরাং ব্রহ্মার রাজ্য ক্রিয়াত্মক। ক্রিয়ার কারণই শক্তি, শক্তি হইতে সমুদয় ক্রিয়া যথাযথ ভাবে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সে জন্য এই চতুর্দ্দশ লোকযুক্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়ই শক্তির লীলাক্ষেত্র। ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণু দ্ব্যণু পর্য্যন্ত মহাশক্তিতে শক্তিমান। যোগী.

এই ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য পার হইবার জন্য প্রথমে ক্রিয়ার শরণাপন্ন হন। সাধকগণ তীব্র সাধনায় ইহা উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা পান। ভাবুকগণ ভাবরূপ স্বরসংযোগে ইহার প্রত্যেক তারে ঝংকার দিয়া, রস ও মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর স্বভাববিদ্‌গণ এই বিশাল স্বভাবকে আয়ত্তে আনিবার জন্য ইহার প্রত্যেক তত্ত্ব সাগ্রহে অনুধাবন করিয়া, ইহাকে আপনার বশে আনয়ন করেন। ফল কথা, এই ক্রিয়াত্মক ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য পার না হইলে, কেহই নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

বীণা ও বাণী এই দুই তত্ত্বই ব্রহ্মার রাজ্যের প্রকৃত সম্পত্তি। স্পন্দনাত্মক কার্য্যব্রহ্মে শব্দ গতি ও জ্যোতি অর্থাৎ জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই ত্রিতত্ত্ব বিকশিত। জ্ঞান প্রথম পদে বরিত বলিয়া জ্ঞানকেই অপর দুই তত্ত্বের মূল বলা হয়। ব্রহ্মার বিকাশ জ্ঞানে, তাই তৎকর্তৃক বিকশিত জগতের মূলও জ্ঞান। ব্রহ্মার ব্রাহ্মী শক্তি সে জন্য শুদ্ধ নিষ্কল জ্ঞান নাম ধারিণী। জ্ঞান সমুদয় বিদ্যার মূলীভূত। সেজন্য জ্ঞানপ্রদায়িনী সরস্বতী সমুদয় বিদ্যার মূল। সরস্বতী আরাধনা করিলে বিদ্যা সহজলভ্যা হয়। এ কারণ বিদ্যালাভেচ্ছুগণ বিদ্যালাভ করিবার জন্য, সরস্বতীর আরাধনা করেন। ব্যক্ত বিশ্বের মূল জ্ঞানে, বাণী ও বীণা, অর্থাৎ শব্দ ও স্পন্দন এই দুই প্রবাহ বর্ত্তমান, জ্ঞানপ্রদায়িনী সরস্বতী বাণী ও বীণাধারিণী। তিনি সমুদয় তত্ত্বের তত্ত্বগ্রাহিণী বলিয়া, জগৎরূপ যন্ত্রের তিনি সমুদয় তারে ঝংকারদায়িনী। যখন যে

তার যে সুরে বাজিলে জগৎ যে ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা তিনি সম্যক অবগতা। সুতরাং তিনি সর্ব্বদা বীণাবাদ্যরতা। তাঁহার বীণার সুরে সুরে সমুদয় ব্যক্ত জগৎ তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে আপন গন্তব্য পথে ধাবিত হয়। সমুদয় জগৎ-তত্ত্ব যাঁহার আয়ত্তাধীন, যিনি এক সময়ে জগতস্থ সমুদয় স্পন্দন-তত্ত্বে সুর যোজনা করিতে সমর্থা, সেই সর্ব্বজ্ঞান-প্রদায়িনী, ব্রহ্মের নিষ্কল ব্রাহ্মীশক্তি সরস্বতী নামে অভিহিতা।

ব্রহ্মায় পিতৃশক্তি ও মাতৃ শক্তি দুই শক্তি সমভাবে বিদ্যমান বলিয়া ব্রহ্মা চিরকুমার বা সমভাবাপন্ন মহাসিদ্ধ সাধক। সেজন্য সরস্বতী ব্রহ্মার অন্তরস্থ মহাশক্তি হইলেও তিনি চিরকুমারী। ব্রহ্মার প্রথমজাত মানসপুত্র সমূহও সেকারণ কৌমার-ব্রতধারী। ব্রহ্মারূপ সমষ্টি তড়িৎকেন্দ্রই যদিও ব্রহ্মাণ্ডবিকাশের প্রধান কারণ, তথাপি যতক্ষণ না উহাতে সম্যক তাপের বিকাশ হইয়া, উহা সম ও বিষম দুই ভাগে রীতিমত বিভক্ত না হয়, ততক্ষণ ব্যক্ত সৃষ্টি কখনই বিশেষরূপে বিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। কিন্তু উহা বিভক্ত হইলেও, কখন উভয়ে সমান রূপ গুণ ও কার্য্যশক্তিতে সমতুল্য হয় না। যদি উভয়ে সমতুল্য হইত, তাহা হইলে কখনই সৃষ্টি বিকাশপথে বিকশিত হইতে পারিত না। আবার উভয়ের তুল্যগুণে উভয়ে একভাবাপন্ন হইয়া, সৃষ্টিকে স্তব্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিত। সেজন্য সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাদের পরস্পরের বিভিন্ন গুণাবলী স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত করিয়া-ছেন। সৎরূপ ব্রহ্মতেজে, চিৎরূপ গতিশক্তি অথবা সতে

রজ সম্মিলিত না হইলে, কখন সৃষ্টি বিবৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। যতক্ষণ না, ব্রহ্মাণ্ডরূপ তড়িৎঅণ্ডে, তাপরূপ দ্বিতীয় বস্তুর সমাবেশ হয়, ততক্ষণ তাহা কার্য্যাবস্থায় আইসে না। যতদিনে উহাতে তাপের বিকাশ হইয়াছিল, ঋষিগণ তাহার কাল নির্ণয় করিয়া, ব্রহ্মালোকের এক বৎসর সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রে তাই উক্ত আছে, ব্রহ্মা ব্রাহ্ম সম্বৎসরকাল উক্ত অণ্ডে নিবাস করিয়া উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। উহারই এক অংশ পুরুষ ও অপর অংশ স্ত্রী নামে কথিত। ব্রহ্মায় ত্রিগুণ বর্ত্তমান থাকিলেও প্রথমতঃ জ্ঞানেরই সম্যক প্রভাব। যদিও ব্রহ্মা হইতে ব্যক্ত অধিক ব্যক্তত্বে পরিণত, ইচ্ছাশক্তি অবকাশে ক্রিয়া রূপে বিকশিত, তথাপি ব্রহ্মা ক্রিয়া জ্ঞান সমাচ্ছন্ন। ব্রহ্মা, বিশুদ্ধ সৃষ্টিকারী রজশক্তি, ইহা স্থিতিরূপী সৎসত্তায় সতত বিরাজমান। সেজন্য সতের প্রাধান্যে ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইলেও তাহা প্রথমতঃ সৎসত্তায় সমাচ্ছন্ন থাকে, যেমন কোন ক্লান্ত ব্যক্তি আসন্ন নিদ্রাদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া, যদি বলপূর্ব্বক কোন অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হয়, তাহা হইলে সে যেমন উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সময়েও মধ্যে মধ্যে নিদ্রার আবেশে অবসন্ন হইয়া, সম্যক ব্যক্ত কার্য্যের উপযোগী হয় না। অথবা যদি কোন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ ব্যক্তি, অসংখ্য কার্য্যে সমাচ্ছন্ন হইয়া, তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য বিশ্রামকে সবলে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সাগ্রহে যথাকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তির যেমন কার্য্য সম্পাদন অবশ্য কর্ত্তব্য

হইলেও, নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া তাহার প্রতিকার্য্যে নিদ্রার আলস্য ভাবই পরিস্ফুট হইয়া প্রকৃত কার্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। আর শেষোক্ত ব্যক্তির বিশ্রাম অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও কার্য্যের কার্য্যশক্তিতে তাহা যেমন সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মায় ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও, তাহা 'সৎ' সত্তার প্রাধান্যে, অর্থাৎ জ্ঞানে প্রথমতঃ আচ্ছন্নভাবেই থাকে। সেই জ্ঞানকৃত ইচ্ছায় তাঁহা কর্ত্তৃক প্রথম উৎপন্ন মানস-পুত্রগণের ও সমভাবের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কাজেই ব্রহ্মায় ক্রিয়াশক্তির বিকাশ অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও প্রথমাবস্থায় তাহাতে সমতা বা সত্ত্বগুণের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। তাই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি চির-প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মায় সমতা অধিক বলিয়া, ব্রহ্মার ব্রাহ্মী-শক্তি তাঁর রমণী-পদে বরিত না হইয়া, তাঁহার কন্যা নামে অভিহিতা। কিন্তু ব্রহ্মারূপ 'স'তে 'চিৎ'রূপ দ্বিতীয় বস্তু সংযোজিত হইয়া সৃষ্টিকে বিকাশ করিয়াছিল। সেইজন্য এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই পরবর্ত্তী পৌরাণিক কালে ব্রহ্মাকে কন্যাগামী কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

জগতের তৃতীয় অবস্থা।

সত্ত্বা, শক্তি, বস্তু।

সৃষ্টি তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হইলে পর, ইহাতে সমুদয় লোকাদির বিকাশ হইয়া থাকে। এই লোকবিকাশ সম্বন্ধে মহাত্মগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, যে হৈমময় অণ্ডাকার চিদাভাস বা গুহ্যতেজ ইতঃপূর্ব্বে একত্র ঘনীভূত বা সমষ্টি আকারে একার্ণবীভূত মহাকারণে প্রবহমান হইয়াছিল, এই তৃতীয় অবস্থায় তাহা তাহার আভ্যন্তরীণ উত্তাপে সংকর্ষিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এবং উহার মধ্যভাগ অবকাশ বা ফাঁকযুক্ত হইয়া পড়াতে গতি অবাধে গতি প্রাপ্ত হইয়া আভ্যন্তরীণ তাপের বাষ্পীয় কণাকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া দেয়, অর্থাৎ ঐ অণ্ডের যাহা সূক্ষ্মাংশ তাহা সূক্ষ্মতা নিবন্ধন ঊর্দ্ধ-গামী হইয়া যায়, আর যাহা স্থূলাংশ বা উহার নিম্নভাগ তাহা স্থূলত্ব নিবন্ধন নিম্নগামী হইয়া ক্ষিতিজাতীয় কঠিন স্থূলতত্ত্বে পরিণত হয়। মধ্যের ঐ অবকাশই আকাশ পদবাচ্য। ঐ ভূমিতেই গতি সম্যক্ প্রসরতা প্রাপ্ত হয়। গতিদ্বারায় বাষ্পী-ভূত তেজকণা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। এবং স্থূল অংশ নিম্ন-

গামী হইয়া পড়ে। মধ্যস্থ মহাবকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র পৃথিব্যাদি লোক, অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত, অন্তরীক্ষ ইত্যাদি সৃজিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সেই মহান্ অবকাশে স্তরবৎ, অর্থাৎ যাহার পর যাহা সেইরূপ ভাবে সন্নিবেশিত হয়।

ইহা হইতে বুঝা যায়, সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থা লোক সৃষ্টির অবস্থা। এই অবস্থায় এক মাত্র তেজোভাস বা হৈমময় অণ্ড আপনার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ বা স্বীয় ধ্যানবলে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় লোকের বিকাশ করিয়া দেয়। যে বস্তু প্রথমে একা ছিলেন, এই অবস্থা হইতে তিনি বহুতে পরিণত হইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ "একোহম্ বহুস্যামঃ" হইয়া সৃষ্টিরূপ মহাযজ্ঞে আপনাকে আহুতিপ্রদান করিলেন। তিনি প্রেমবশে আত্মপ্রীতিরূপ গুহ্য তেজোভাস বা চিদ্বীজকে মায়ারূপিণী মহাকাশের মহাধারে অর্পণ বা স্থাপন করিলেন। তত্ত্বদর্শিগণ সৃষ্টিকর্ত্তার ত্রিভাবের ত্রিতত্ত্বে (দর্শন, স্পর্শন, ও বর্ষণ) অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সৃষ্টির তৃতীয় অবস্থাকেই "একা আমি আমার মত বহু হউক" বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। এই অবস্থায় একমাত্র ব্রহ্মবস্তু বহুতে পরিণত হইলেন।

যে ঘনীভূত তৈজসকেন্দ্র বা তড়িৎসমষ্টি সহস্রাংশুসমপ্রভ হৈম অণ্ডের ন্যায় গোলাকার অণ্ডবৎ একার্ণব-কারণবারিতে ভাসমান ছিল, তাহাই আভ্যন্তরীণ উত্তাপে বিদারিত হইয়া এক অংশে দিব, অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক ও অপর অংশে পৃথিব্যাদি লোক ও মধ্যের মহা অবকাশে অষ্ট দিক ও নিত্য সমুদ্রের

বিকাশ করিল। দিব অর্থে সচরাচর জ্যোতিকে বুঝায়। তাহা হইলে যাহা উক্ত অণ্ডের তৈজস অংশ, তাহা হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধলোকের বা দিব্যস্থানের বিকাশ হয় এবং যাহা উহার নিম্নাংশ, যাহাকে কঠিন শীতল ও স্থূল বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহাতে পৃথিবী, এবং মধ্যভূমিকে অন্তরীক্ষ ও আকাশ বলা হয়। তেজোময় দিবাংশেও সপ্তভাগ এবং যাহা নিম্নাংশ তাহাতেও সপ্ত বিভাগ। এই দ্বিসপ্ত বিভাগই চতুর্দ্দশ লোক নামে অভিহিত। সমুদয় বিভাগেরই আবার সপ্ত সপ্ত বিভাগ বর্ত্তমান। তত্ত্ববিদ্‌গণ সর্ব্বত্রই সপ্ত পর্য্যায়ের বিকাশ পরিদৃষ্ট করেন। কি পৃথিবী কি অন্তরীক্ষ কি দিব্যস্থান সর্ব্বত্রই সর্ব্বস্থানে সপ্ততত্ত্ব আছে। অন্তরীক্ষে প্রতিগ্রহ-নক্ষত্রেরই এই সপ্তবিভাগ বর্ত্তমান। পৃথিবীতেও সপ্ত তত্ত্ব ও তাহার অভ্যন্তরে পাতালাদি সপ্ত লোক আছে। তাহা ছাড়া সমুদয় গ্রহ-নক্ষত্রেও বহু অবান্তর বিভাগ আছে। ইহাদিগকে নিজস্ব ও পরস্ব বিভাগ বলে। সমুদয় লইয়া বিরাট বিশ্ব। বিশ্বের দুই বিভাগে দুইটি কেন্দ্র আছে, ইহার মধ্যে যে কেন্দ্র নিম্নসপ্তভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা সুমেরু, আর যাহা ঊর্দ্ধ সপ্তলোক সংশ্লিষ্ট তাহাকে ধ্রুব-কেন্দ্র বলে। ধ্রুব-কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত ধীর স্থির, ইহাকে অবলম্বন করিয়া ব্যক্ত জগৎ আপন গন্তব্য পথে ধাবিত। এই কেন্দ্রই মহৎ-যোনী নামে খ্যাত। ইহা হইতেই ব্রহ্মের জগৎবিকাশিনী শক্তি সাক্ষাৎ সৃষ্টিকারিণী শক্তি লইয়া বিবিধ-বেশে চিত্র-বিচিত্ররূপ জগৎরচনায় প্রবৃত্ত। একই শক্তি এই

স্থান হইতে বিবিধবেশে দৃশ্যমান। এই স্থির কেন্দ্রেই মহাকাশ-বিক্ষিপ্ত গুহ্য তেজোভাস বা তড়িতকণা একত্রিত হইয়া তৈজস কেন্দ্রে পরিণত। এই তৈজস কেন্দ্রেই স্বয়ং সম্যক তেজ লোকপিতামহ ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ। উত্তাপরূপ তপস্যা দ্বারা তিনি উক্ত তেজোময় কেন্দ্র হইতে তেজকণা বিকীরিত করিয়া পর্য্যায় ক্রমে চতুর্দ্দশ লোকের রচনা করিয়া, তাহাদের যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন। বস্ত্রের যেরূপ, সর্ব্বাঙ্গে সূত্রাবলী বিস্তীর্ণ থাকিলেও তাহার দুই পার্শ্বের দুই কেন্দ্রে সমষ্টি ভাবে সূত্রনিকর গ্রথিত থাকে,তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শক্তি সূত্রে বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় দুই পার্শ্বের দুই কেন্দ্রে সমুদয় বিশ্বব্যাপী শক্তিনিকর সমষ্টিভাবে বিদ্যমান থাকে। তাহাকেই সচরাচর ধ্রুব ও সুমেরু নামে ব্যাখ্যাত করা হয়। এই দুই কেন্দ্র ধরিয়াই জীব সংসার-ক্ষেত্রে আগমন ও নির্গমন করিয়া থাকে। ইহাই যোনি, অর্থাৎ কারণ নামে খ্যাত। যোগিগণ ঊর্দ্ধযোনী, অর্থাৎ ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল চক্রে মন স্থাপন করিয়া সংসার-ক্ষেত্রের পরপারে গমন করিয়া থাকেন। ইহাতে ব্রহ্মের অন্তঃস্থ কামনা বা কারণ প্রকাশ্য কার্য্যরূপে বিকশিত হয় বলিয়া, এই ক্ষেত্রের অপর নাম আজ্ঞাচক্র, অর্থাৎ এই স্থান হইতে, ব্রহ্মার ইচ্ছা ক্রিয়াতে পরিণত। তাই ইহাকে কর্ম্মক্ষেত্রও বলা হয়। এই ক্ষেত্রে যোগবলে যোগিগণ, প্রাণরূপ মহাবীর্য্যকে সংস্থাপন করিয়া, ঊর্দ্ধরেতা নাম ধারণ করেন। এই ক্ষেত্র সংসারের পর পারে যাইবার পন্থা বা ঘাট বলিয়া ইহার অপর নাম কূল।

ইহাতে জ্যোতির্ম্ময় গুহ্যতেজ কুণ্ডলে কুণ্ডলে অর্থাৎ সার্দ্ধ ত্রিচক্রে অবস্থান করে বলিয়া, ইহাকে কুণ্ডলিনী শক্তিও বলে।

বিকশিত সমষ্টিতেজ হইতেই জগতের বিকাশ, আর উহার অব্যক্তত্বেই জগতের লয়। কুণ্ডলিনীরূপ মহাক্ষেত্রে যখন অব্যক্ত তড়িৎরূপী গুহ্যতেজ সমষ্টিভাবে আসিয়া দর্শন দেয়, তখনি কারণ কার্য্যে পরিণত হয়। অব্যক্ত সত্তা জীবরূপে সাকার দৃশ্য বস্তুতে পরিণত হয়। যে যোগিগণ মুক্তিপথের কামনা করিয়া, যোগাভ্যাসে রত হন, তাঁহারা প্রবল ইচ্ছাশক্তির উত্তেজনায়, উক্ত সার্দ্ধ-ত্রি-কুণ্ডলে কুণ্ডলিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে সরলভাবে পরিচালনা করিয়া, অবহেলে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, পরম কারণে সম্মিলিত হন! কুণ্ডলিনীর ত্রি-আবর্ত্তেই, সত্ব, রজ, তম, ত্রিগুণের ত্রি-কেন্দ্র বর্ত্তমান। ত্রিগুণের ত্রিকেন্দ্র, পরিহার করিলে পর, তবে গুণাতীত নির্গুণ তত্ত্ব লাভ করা যায়। তাই সাধক, যোগরূপ ক্রিয়াদ্বারা, উক্ত, কুণ্ডলিত তেজকে, তাহার স্বরূপে লইয়া গিয়া সমুদয় মনো-বৃত্তিকে, পরিপূর্ণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া, শেষে সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরে পরিণত হন। যে বৃত্তির যে স্বভাব, তাহার সম্যক পরিপুষ্টতা ব্যতীত, কখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া যায় না। এই সর্ব্বাঙ্গের পরিপুষ্টতা কখন একজন্মে কাহারও সংসাধন হয় না। শত শত জন্ম ইহার জন্য অতিবাহিত হইলে, তবে এক এক বৃত্তি, পরিপুষ্ট হয়। যোগিগণ, যোগবলে, শতজন্মের ফল একই জন্মে ভোগ করিয়া লন। যে বৃত্তির যাহা প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তির

পরিপুষ্ট বা ভোগ ব্যতীত কখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয় না। তাই ক্রোধবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণতার জন্য যোগীকে রাক্ষসাদির ভাবে ভাবান্বিত বা তৎভাবযুত দেহ পরিগ্রহণ করিতে হয়। হিংসার জন্য হিংস্রক ব্যাঘ্রাদির রূপ ধারণ বা তৎভাবযুত হইতে হয়। কামবৃত্তির অনুশীলনের জন্য কামপরায়ণ গন্ধর্ব্বাদির মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে হয় অথবা সেই ভাবের স্ফূর্ত্তি করিতে হয়। যাহা প্রকৃতিগত, সাধারণ জীব, শত শত জন্মে ভোগ করে, যোগী স্বাধীন ইচ্ছাবলে একই জীবনে তাহা সম্ভোগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গের পরিপুষ্টতা সাধন নিবন্ধন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরে পরিগণিত হন। সেজন্য যে স্থল হইতে, এই ঊর্দ্ধ লোকে আরোহণ করা যায়, সাধারণতঃ তাহাকেই ঊর্দ্ধ কেন্দ্র বলা হয়।

লোকসৃষ্টি সম্বন্ধে মনুস্মৃতিতে এইরূপ বর্ণিত আছে। ব্রহ্মারূপ সৃষ্টিকারী শক্তি মনের উদ্ধার করিয়া তাহাতে অহং অভিমান (অর্থাৎ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বা ত্রিতত্ত্ব সমন্বিত অহং জ্ঞান) ও সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্মতম অবয়ব সমষ্টি তাহাদের বিকারজ ইন্দ্রিয়গ্রামকে পঞ্চভূতের সহিত সংযোজিত করিয়া সমস্ত জীব সৃষ্টি করিলেন। এই সূক্ষ্মতম ছয়টি অবয়ব যুক্ত তত্ত্বই ব্রহ্মার শরীর নামে কথিত। ব্রহ্মা এই আপন শরীরকে দ্বিধা করিয়া, তাহার অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেকে নারী সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাটকে উৎপাদন করিলেন। এস্থলে শাস্ত্র যাহাকে বিরাট পুরুষ আখ্যা দিতেছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভের স্থূল অবস্থা মাত্র।

স্থূল দেহের অভিমানি সমষ্টিশক্তি, অথবা দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সমুদ্র, ভূমি প্রভৃতি সমগ্র স্থূল জাগতিক শক্তি বা চতুর্দ্দশ ভুবনের কেন্দ্র, বা ঘনীভূত স্থূল সমষ্টিকে বিরাটপুরুষ বা বৈশ্বানর বলে। ঐ বিরাটপুরুষে দুই ভাব বর্ত্তমান আছে। ইহাদের পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ হইতে, মহান একার্ণব-সমুদ্র বিচলিত হইয়া, উহার তেজ অংশ, অর্থাৎ পুংবিভাগ হইতে অসংখ্য তেজপ্রধান গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য্যাদির ন্যায় তেজ-প্রধান আধারের বিকাশ হয়। আর উহার জলীয় অংশ বা স্ত্রী অংশ হইতে চন্দ্রাদির ন্যায়, শৈত্যপ্রধান আধারের বিকাশ হয়। চন্দ্রে শৈত্যাধিক্য দর্শন করিয়া, শাস্ত্র-কর্ত্তারা চন্দ্রকে, সমুদ্রের পুত্র বলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, যে সমুদ্রমন্থন কালে, সমুদ্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। সে কারণ চন্দ্র সমুদ্রের পুত্র বলিয়া গণনীয়। অর্ণব আধিক্যে চন্দ্রের উদ্ভব বলিয়া, পুরাণে এই রূপক কল্পিত হইয়াছে। চন্দ্রে শৈত্যাধিক্য বলিয়া, চন্দ্রকরে তরু, লতা, তৃণ, গুল্ম, জীবজন্তু ইত্যাদির পরিপোষণ হয়। চন্দ্রকে সে কারণ ওষধাধিপতি বলা হয়। আবার চন্দ্রে সূর্য্যের সৌরকর নিপতিত হওয়াতে, চন্দ্রে তৈজসতত্ত্বও অনুভব করা যায়। তাহা ছাড়া চন্দ্রে সম্পূর্ণ তৈজ-সাভাবও নাই। চন্দ্রে শৈত্যাধিক্য হইলেও, তৈজস অংশও তাহাতে যে আছে, তাহা বুঝা যায়। কারণ দ্বিতত্ত্ব ছাড়া জগতে কেহই বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।

এই দ্বিতত্ত্বই বেদের অগ্নি ও সোম। অগ্নি তেজপ্রধান

বলিয়া, অগ্নি সম নামে খ্যাত। সমই পুরুষ, এই সম, সামান্য তৃণ গুল্মাদি হইতে সেই জগতের শেষ কারণ পরমপুরুষে গিয়া নিঃশেষ। যাহাকে শাস্ত্র সকল কারণের কারণ, অথবা এক বারে অকারণ (কেন না যাহাতে গিয়া আর কোন কারণ কেহ খুজিয়া পায় না) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তিনি মহাসাম্যময়, সেজন্য তিনি এক মাত্র পরম তেজ বলিয়া কথিত। অগ্ন্যাদি তেজপ্রধান বস্তু মাত্রকে সেজন্য সম নামে অভিহিত করা যায়। পৃথিবীর সম, অগ্নি। জগৎ যখন চতুর্দ্দশ লোক লইয়া বিস্তৃত,, তখন ঋষিগণ যে লোকের যাহা 'সম' তাহার তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া তাহার আরাধনার জন্য তৎপ্রদেশস্থ অধিবাসীদিগকে তৎনামযুক্ত 'সম' শক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত করিতেন। তাই বেদের প্রথমে সেই সমতাপ্রধান পরম পুরুষকে অগ্নি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই অগ্নি সেই পরম অগ্নি হইলেও দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা যুক্ত জগত মধ্য হইতে তাহাকে স্তুতি করা হইতেছে বলিয়া, ইহাকে উক্ত লোকের গুণ ধর্ম্ম অনুসারে অগ্নি নামেই সম্বোধন করা হইয়াছে।

সোম, জলপ্রধান বলিয়া, সোম নারীভাবযুক্ত, সুতরাং সোমে বৈষম্য শক্তির প্রবলতা। ইহাও দৃশ্য-জগতের সামান্য ধূলিকণা হইতে অবশেষে সেই ব্রহ্মের জগদ্‌বিকাশিনী ব্রাহ্মীশক্তি বা মহামায়ায় গিয়া নিঃশেষিত। মায়া, শক্তি, সমুদয় দৃশ্যপ্রপঞ্চের কারণ হইলেও, মায়াতে স্বয়ং সৃষ্টিসামর্থ্য নাই। সৃষ্টিসামর্থ্য কেবল মাত্র সেই একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ

সত্তাতেই আছে। সতের ভাব, বা ইচ্ছা বলিয়া প্রকৃতি স্বভাব নামে অভিহিতা, অর্থাৎ স'তে যখন যে ভাব সমুদ্ভূত হয়, তাহাই তাহার স্বভাবে প্রতিফলিত, সেজন্য স্বভাব 'সতে'র, বা প্রকৃতি পুরুষের অধীন। সোম, অথবা বিষম শক্তি তাই সম নামক প্রথম শক্তির অধীন। এ কারণ সোম অগ্নির অধীন। স্থূল-জগতে তাই সূর্য্যের সৌরকর নিপতিত হওয়াতেই চন্দ্রের উজ্জ্বলতা। সোম রসপ্রধান। রসেই স্থিতি স্থাপকতা গুণ থাকাতে চন্দ্র সমুদয় রসের আধার। চন্দ্রের স্নিগ্ধ করে সমুদয় বৃক্ষ লতা সঞ্জীবিত হয়। চন্দ্রই সোম নামে বিখ্যাত, চন্দ্রের স্নিগ্ধ গুণ যে ওষধিতে অধিক, অর্থাৎ যাহা অধিক স্নিগ্ধ ও পুষ্টি-কারক, যাহা হইতে সমুদয় শরীরের রসধাতু সমধিক উজ্জ্বল ও পুষ্টতা প্রাপ্ত হয়, তাহাই সোমলতা নামে বিখ্যাত। ইহা শরীরের রসধাতু অর্থাৎ স্নায়ুচক্রের সমধিক, তেজবর্দ্ধক বলিয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক জড়াশ্রিত নর-নারীর পরম ঔষধরূপে ইহা ব্যবহৃত হইত।

ব্রহ্মা হইতেই বিরাটের বিকাশ, ব্রহ্মার একই শরীরের দুই বিভাগে স্ত্রী ও পুরুষ নামধেয় দুই তত্ত্ব বিদ্যমান। তেজবিভাগ পুরুষ ও জলবিভাগ নারী। দুই অংশেই ছয় ছয় বিভাগ। ইহাই ব্রহ্মারূপী সৃষ্টিশক্তির বিরাট দেহ, আর ইহার অভ্যন্তরস্থ সমষ্টিশক্তিই ব্রহ্মা বা দেহী। উক্ত কেন্দ্রীভূত তড়িৎসমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের সুমেরু কেন্দ্র নামে অভিহিত। ব্যক্ত জগতের তৈজস-তত্ত্ব অগ্নি, সূর্য্য, ইহারাই এই দৃশ্যজগতের পুরুষ নামে কথিত। জগৎ স্থূল, তাহার ব্যক্ত তৈজস-তত্ত্বও সে কারণ স্থূলরূপে অভি-

ব্যক্ত। পৃথিবীর উপাদান অনুসারে অগ্নিই পৃথিবীর যথার্থ তৈজস্‌তত্ত্ব। তৎপরে সূর্য্য; আর চন্দ্র ও অর্ণবই ইহার স্ত্রীতত্ত্ব। পৃথিবীর পার্থিব-কেন্দ্রই বিরাট বা ঘনীভূত অবস্থা; পৃথিবীর পার্থিব-কেন্দ্রে ও চতুর্দ্দশ ভুবনের কেন্দ্রে একই উপাদান বিদ্য-মান। আমাদের অধিষ্ঠানভূত স্থূল জগতের যাহাকে সচরাচর ত্রিতত্ত্ব নামে কল্পনা করা যায়, তাহা সাধারণতঃ অগ্নি, জল ও ক্ষিতি, ইহাই বৈজ্ঞানিকের কঠিন, বায়ব ও তরল নামক ত্রিতত্ত্ব; ইহারই অপর নাম সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী।

যে সূক্ষ্ম অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্র হইতে জগতের সূক্ষ্ম সৃষ্টি-তত্ত্বের উদ্ভব, তাহাই ব্রহ্মার অবয়ব। তাহারই অর্দ্ধ বিভাগে পুং-তত্ত্ব ও অর্দ্ধ অবয়বে নারীচিহ্ন বর্ত্তমান। এই উভয় তত্ত্ব হইতেই স্থূল দেহের উৎপত্তি। উভয় বিভাগই ছয় ছয় তত্ত্ব সমন্বিত। যে তত্ত্বে নারীভাগের বিকাশ, তাহা অর্ণবীয় কেন্দ্র ও যাহাতে পুংভাব অভিব্যক্ত, তাহাকে তৈজস্‌-কেন্দ্র কহে। এই দুই বিভাগ হইতে সমুদয় স্থূল জগতের বিকাশ। কি গ্রহ, কি নক্ষত্র, কি চন্দ্র, কি সূর্য্য, কি মানব, কি দেব সর্ব্বত্রই সর্ব্বাধার এই একই নিয়মে নিয়মিত। ব্যক্ত জগতেও সেইরূপ যাহাতে তেজতত্ত্বের আধিক্য, অর্থাৎ যাহা কর্ত্তব্যপ্রধান তাহাকে পুরুষ, ও যাহাতে ভাবাধিক্য বা মনের প্রভাব অধিক তাহাকে স্ত্রী নামে পরিচয় দেওয়া হয়। ইহারাই ব্যক্ত জগতের পিতৃ ও মাতৃ স্থানীয়। ইহা হইতে সমুদয় জগৎ ও জাগতিক বস্তুর বিকাশ। এ স্থলে তেজ ও জল পিতৃ ও মাতৃ স্থানীয়।

তাহাদের পুত্র স্থানীয় পার্থিবকেন্দ্র বা চতুর্দ্দশ ভুবন। উহার আধার বা দেহই জীবজন্তু-সমন্বিত পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন।

যাহা হউক, ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে স্থূল জগতের ত্রিতত্ত্ব অগ্নি, জল, ও ক্ষিতি। স্থূল তেজের শরীর অগ্নি ও সূর্য্য, স্থূল জলের শরীর চন্দ্র ও সমুদ্র, পার্থিবকেন্দ্রের শরীর পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থ। এই ত্রি-উপাদানই স্থূল জগতের পার্থিব কেন্দ্র। আবার ইহা অর্থাৎ এই একই বস্তু চতুর্দ্দশ ভুবনের মহান কেন্দ্র। ইহাকেই শাস্ত্র বিরাট কহেন। বিরাটের জলই বিস্তীর্ণ দেহ বা শয্যা, উহাই ক্ষীরোদক নামে কল্পিত। উহার অভ্যন্তরস্থ পরম সত্তাই বৈশ্বানর বা বিষ্ণু।

মহাকাশ বা মহাকাল কারণ জগতস্থ ব্রহ্ম, বা ঈশ্বরের আধার, উহার অন্তঃস্থ গুণই মহাশব্দ ও মহাগতি, তজ্জন্য তৎশায়ী পুরুষ মহাবিষ্ণু, কারণাব্ধিশায়ী প্রথম পুরুষ নামে কথিত। ইহা শ্বেতবর্ণ বা বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণজ সূক্ষ্ম জগতস্থ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভের দেহ অহংকার ও সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্ম অবয়ব স্বরূপ তৈজস বা তেজযুক্ত, দ্রবীভূত মহা মানসতত্ত্ব-ব্রহ্মায় শক্তির বিকাশ বলিয়া ব্রহ্মা রজগুণীয়, বা সাক্ষাৎ প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়াশক্তি। ইহার বর্ণ লোহিত বলিয়া কল্পনা করা যায়। তৃতীয় পর্য্যায়ের দেহ বা আধার চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিব্যাদি গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত বিশ্ব কিংবা তৎসমুদয়ের উপাদান অগ্নি জল ও ক্ষিতি। তৃতীয় পর্য্যায়ের কারণ সমধিক অবকাশযুক্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত বলিয়া উহা স্বভাবতঃ স্থিতিশীল। যাহাতে

স্থিতিস্থাপকতা বিদ্যমান তাহা নীলবর্ণ নামে কল্পিত। তাহাতে যে পুরুষ শায়িত থাকেন, তাঁহার দেহকে সেজন্য নীলাভ বলিয়া কল্পনা করা হয়।

জগতের মূলে যে কারণসমষ্টি বর্ত্তমান, তাহাতে কালাগমে "একোঽহম বহু স্যাম" ভাব উদিত হইয়া জগৎসৃষ্টির কারণ হয়। সেই কামই জগতের তৃতীয় পর্য্যায়ে, অথবা চিত্তাকাশে আসিয়া যথার্থ ব্যক্তপথে বিকশিত হয়। সেই অব্যক্ত কামের কামকণিকা বহন করিয়া, তৃতীয় পুরুষ বৈশ্বানর বা বিষ্ণু বিরাট মূর্ত্তিতে বিশাল জগতে আবির্ভূত। বিরাটেই দুই তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ, অর্থাৎ রূপ ও রস বা সৃষ্টি ও স্থিতি। বিরাটরূপী বিষ্ণু, তচ্ছক্তির সহিত মিলিত হইয়া তাহার দুই তত্ত্বকে সখা-সখিভাবে লইয়া জগৎ রূপ ব্রজ-ধামের কুঞ্জরূপ কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিহারপরায়ণ। তিনি যখন যে কুঞ্জে, বিহারশীল তাঁহার সখা সখিগণ তখন তদ্ভাবে সজ্জিত। তাঁহার বংশীর তালে তালে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সতত নৃত্যরত। যে স্পন্দন ও শব্দ মহাকাশে মহাজ্যোতি ও মহাগতিতে অভিব্যক্ত, ব্রহ্মালোকে তাহাই বাণী ও বীণা। তৃতীয় পর্য্যায়ে তাহাই বংশী নামে কল্পিত। অব্যক্ত মহাশব্দে যেমন সমুদয় জগৎ-তত্ত্ব নিহিত, বীণার মধুর ঝংকারে যেমন সমুদয় মনোচ্ছ্বাস সুবিন্যস্ত, বংশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে তেমনি সৃষ্টির সমুদয় ভাব উচ্ছ্বসিত। তাই চিত্তরূপ বৃন্দাবনে মধুর বংশীরবে চরাচর উচ্ছ্বসিত হইয়া নৃত্য বা স্পন্দন-যুক্ত। যে শব্দ মহাকাশে "পরা বাক্," চিদাকাশে "পশ্যন্তি," তাহাই তৃতীয়ে মধ্যমা। ইহার ধ্বনি স্বভাবের গতিতে ধ্বনিত,

সেই স্বাভাবিক গতিই শ্বাস ও প্রশ্বাস। সেজন্য এই বংশী সতত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে বাদ্যরত।

তৃতীয়ের যাহা সত্তা শক্তি ও বস্তু, তাহাকেই তেজ জল ও পার্থিব কেন্দ্র বলা হয়। তেজের যাহা তৈজসৃতত্ত্ব, তাহাই অগ্নি ও সূর্য্য, জলের যাহা রসাধার, তাহাই চন্দ্রে ও সমুদ্রে বিকাশ। বস্তুর যাহা বস্তুত্ব তাহা পৃথিবী ও পার্থিব তত্ত্বে নিহিত। এই ত্রি-পর্য্যায়ের ত্রি-তত্ত্বই সত্তা, শক্তি, ও বস্তু নামে বিখ্যাত।

পঞ্চম অধ্যায়।

জগতের চতুর্থাবস্থা।

কারণ, কার্য্য, ও আধার।

চতুর্থাবস্থা বলিলে, মনু প্রভৃতি মানসপুত্রগণের সৃষ্টিকাল বুঝায়। যাঁহারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্যক্ত সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সৃষ্ট হইয়া, জগতে বিশুদ্ধ রজশক্তির বিকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের দ্বারা সমুদয় চরাচর প্রাণশক্তিতে ভাসমান হইয়া জীব নামে কথিত হইয়াছিল, সেই অবস্থাই জগতের চতুর্থ অবস্থা। যে অবস্থায় অপরিচ্ছন্ন ব্রহ্ম বস্তু, কাল কর্ত্তৃক কর্ষিত হইতে হইতে প্রথম (অপরিচ্ছন্ন বা আত্মার প্রকৃত অবস্থা) দ্বিতীয় (বা সূক্ষ্ম (ও তৃতীয় (বিরাট) অবস্থা পরিহার করিয়া, দেশ কাল পাত্র অবস্থার অধীনতা স্বীকারান্তর দশচক্রে (দশ ইন্দ্রিয়ে) সীমাবদ্ধ আধারে ভূত (স্থূলরূপে) বেশে ব্যক্ত সংসারে অবতীর্ণ। যে অবস্থায় অব্যক্ত মহাকারণ চিত্তাকাশ ও জড়াকাশে ভাবান্তরিত, যে অবস্থায় সমষ্টি জ্ঞান ও চৈতন্য ব্যষ্টি চিদাভাস বা চিদ্বিম্বে পরিণত হইয়া, অণু-পরমাণুরূপে জড়াকাশে ব্যবস্থিত, সেই অবস্থাকেই চতুর্থাবস্থা বলা হয়, অর্থাৎ অব্যক্ত মহানতত্ত্ব যেখানে

আসিয়া তাঁহার দুর্দ্দমনীয় কামনা সংযত করিয়া সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়েন, যে স্থল সৃষ্টির প্রবৃত্তিমার্গের শেষ সীমা,—যে স্থলে উপনীত হইয়া সৃষ্টি আবার তাঁহার স্বরূপে যাইবার প্রয়াস পায়, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই চতুর্থাবস্থা কহেন।

সৃষ্টির তৃতীয়াবস্থা বিরাট বা বৈশ্বানরের সৃষ্টি। এই অবস্থায় সূক্ষ্ম সৃষ্টি বিরাটে অভিব্যক্ত, সুতরাং যে লোকের যাহা কারণ ও কার্য্য, এই ক্রম হইতে সে তাহাতে যথাযথ সন্নিবেশিত ও বিস্তৃতি লাভ করে বলিয়া ইহা স্থিত কাল নামে প্রসিদ্ধ,সে জন্য ইহার ত্রি-তত্ত্ব সত্তা শক্তি,বস্তু,বা কারণ,কার্য্য,ও আধারনামে কল্পিত। স্থিতি-কালে চিত্তাকাশের অভিব্যক্তি। চিত্তাকাশ মহাকাশের তৃতীয়াবস্থা কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মের বিকাশ, কর্ত্তা প্রথমাবস্থায় একা, কাজেই তাঁহার কর্ম্ম তখন তাহাতেই লীন। কর্ত্তা ছাড়া সেই অবস্থায় কর্ম্ম খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব, তাই কর্ত্তা তখন "একম্" কিন্তু "একম্" হইলেও, কর্ম্মের অস্তিত্ব কর্ত্তায় যে আছে একথা তখনও স্বীকার্য্য, নতুবা তাহা যদি সেই সময় কর্ত্তায় না থাকিয়া পরে অন্য কোন স্থান কিংবা অন্য কোন কারণ হইতে সম্ভূত হইত, তাহা হইলে কর্ত্তার "একম্" কর্ত্তৃত্ব ভবিষ্যতে কোনমতে রক্ষিত হইতে পারিত না। সে জন্য বলিতে হইবে, সেই সময়ও কর্ত্তার মধ্যে কর্ম্ম অবস্থিত ছিল, কেবল কর্ত্তার একাধিপত্য কর্ত্তৃত্বে তাহার কারণে তখন তাহা সমাচ্ছন্ন বলিয়া কার্য্য ও কারণে অথবা কর্ত্তায় ও কর্ম্মে কোন ভেদাভেদ ছিল না। সেই অবস্থা অব্যক্ত ও নিত্য নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রবিদ্‌গণ ইহাকে পরম তত্ত্ব

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহার পরে কর্ত্তা আর এক অবস্থায় উপনীত হন। যখন তাঁহার মহামানসে সৃষ্টিকাম ঘনীভূত হয়, এবং তাহা ভাবাবেশে দ্রবধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া, সূক্ষ্মভাবে পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হয়। এই অবস্থায় ঐ কারণ প্রধান বস্তু কথঞ্চিত ক্রিয়াশীল হন বলিয়া উনি জ্যোতির্ম্ময়ী চিদাভাসযুক্তা মূলা প্রকৃতি বা সচ্চিদানন্দের সৎ চিৎ আনন্দ যুক্তা শক্তিময়ী প্রকৃতি যুক্ত ঈশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হন। ইনিই দার্শনিকের সূক্ষ্মাকাশস্থ তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিকের জ্যোতির্ম্ময়ী চিদাকাশস্থ সত্তা। পরে ঐ কর্ত্তা যখন উক্ত সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ পরিহার করিয়া, স্থূলরূপে বিরাটে পরিণত, তখন অভ্যন্তরস্থ মহাশক্তি ও স্থূলপ্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত, এই স্থূল প্রপঞ্চই চিত্তাকাশ; ইহাই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূল। সমুদয় স্থূল বস্তু এই স্থূল কারণে স্থিত। নিরাকার চিদ্বিম্ব বা মানসাণু যে আকাশে তড়িদণু বা পরমাণু নামে কল্পিত। সমুদয় ভৌতিক প্রপঞ্চের মূল বলিয়া ইহার অপর নাম জড়াকাশ। যে অবস্থায় সৃষ্টি লোকসন্নিবেশ সমাপণ করিয়া জীবসৃষ্টিতে অবতরণ করে, সেই অবস্থায় ঐ সর্ব্বব্যাপী একত্ব সূক্ষ্ম বস্তুতে সমুদয় ব্যক্ত সৃষ্টি ভাসমান হয়। যে অবস্থাতেই ঐ সূক্ষ্মবস্তু অবস্থান করুন, সর্ব্বত্রই তাঁহার দুই ভাব। তবে কোথায় ব্যক্ত, কোথায় অব্যক্ত। অব্যক্তে, তিনি পুরুষ ও তাঁহার অন্তরস্থ শক্তি মায়া। সূক্ষ্মে তিনি ব্রহ্ম বা পুরুষ, তাঁহার অন্তরস্থ শক্তি প্রকৃতি। স্থূলে তিনি অগ্নি, ও তাঁহার অন্তরস্থ শক্তি জল বা সোম। ব্যক্তে তিনি সম ও তাঁহার অন্তরস্থ শক্তিই বিষম নামে প্রসিদ্ধ।

সৃষ্টি চারিভাগে বিভক্ত, আবার প্রতি চারি ভাগই চারি চারি ভাগে বিভক্ত, প্রতি ভাগের যিনি অন্ত্যস্থ মহাসত্ত্বা, তিনিই প্রপিতামহ পদবাচ্য।

যাহা হউক, সৃষ্টি যখন স্থূলপ্রপঞ্চে পরিণত হইল, তখন তাহাতে জীব আসিবার কাল সমাগত হইল। এই জীবসৃষ্টির কালই চতুর্থাবস্থা বা মনুর কাল নামে প্রসিদ্ধ। কেন এই সৃষ্টি মনুরকাল নামে কথিত হইল, তৎসম্বন্ধে বুঝিতে হইলে, শাস্ত্রপথ অবলম্বন করিতে হয়। মনুসংহিতায় উক্ত আছে,—ভগবান মনু মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যখন সৃষ্টিকাহিনী বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সৃষ্টির দ্বিপর্য্যায় বর্ণনা করিয়া বিরাট পুরুষের সৃষ্টিতে অবতরণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে মহাপুরুষগণ সেই বিরাট পুরুষ, যাঁহাকে বহু তপস্যা দ্বারা স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই আমি এই মনু। এবং আমিও পরবর্ত্তী সৃষ্টির জন্য দুশ্চর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ দশজন মহর্ষি বা প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি, এবং সেই দশজন আবার মহাতেজস্বী সপ্ত মনুর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যে দেব সমূহকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই, অর্থাৎ যাহার দেহের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে স্থিত বলিয়া লোক সৃষ্টির পর জীব সৃষ্টিতে দর্শন দান করিয়াছিলেন। এমন দেবগণ ও তাঁহাদের বাসস্থান, ও অসীম-ক্ষমতাসম্পন্ন বহু মহর্ষি, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, অসুর, নাগ, গরুড়াদি পক্ষী এবং পৃথক পৃথক দেবগণ, বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, নানাবর্ণ, জ্যোতির্দ্দণ্ড, ইন্দ্রধনু, উল্কা,

নির্ঘাৎ, অর্থাৎ ভূমি ও অন্তরীক্ষগত উৎপাতধ্বনি, ধূমকেতু, ধ্রুব ও অগস্ত্যাদি ও নানাপ্রকার জ্যোতিষ্কমণ্ডলি কিন্নর বানর মৎস্য ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মগণ আমার আজ্ঞাক্রমে তাঁহাদের উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মনুর এই উক্তি হইতেই বোধগম্য হয়, যে বিরাটের বিস্তৃতি, অর্থাৎ লোকসৃষ্টির পরই মনুরূপ লোক-দেবতার আবির্ভাবের কাল। এই লোক দেবতার পরপর্য্যায়ে জীবের আগমন অনিবার্য্য। কিন্তু লোকদেবতা একেবারে কি প্রকারে জীব-দেবতা হইবেন, তাই তাঁহাকে আবার অপর দশজন মনুর সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। এই দশজন, দশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হইয়া দেহরূপ আধারে সন্নিবেশিত হইয়াছিলেন। আর তাঁহাদের কৃত মরিচাদি সপ্ত জন, দেহের প্রতিকোষের সপ্ত সপ্ত তত্ত্বের পরিচালক জীবনী বা ক্রিয়া শক্তি রূপ তড়িৎ প্রবাহ।

ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশ লোকের চতুর্দ্দশ ক্রম লইয়া মানব দেহ নির্ম্মিত। তন্মধ্যে সপ্ত ঊর্দ্ধ, সপ্ত অধ। এই চতুর্দ্দশ ক্রমের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের চৌদ্দ পর্য্যায় সংযুক্ত। তাহারা যে স্পন্দনে স্পন্দিত, যে আভাসে আলোকিত, তাহা জীবের ঐ সপ্তক্রমে ব্যবস্থিত। ঊর্দ্ধ ও অধ, অর্থাৎ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এই দুইটি বস্তু উপরি উপরি, নীচে হইতে উঠিবার সময় ও উপর হইতে নাবিবার সময় উভয় দিকেই সেজন্য সাত সাত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেজন্য ইহা সপ্তনামেই কথিত হয়। পরবর্ত্তী সপ্ত মনু, ঐ সপ্ত ক্রমের, দৈবশক্তি,—সপ্তেই চৌদ্দ স্থিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় গুণেই

প্রত্যেকে বিভূষিত, তাই চৌদ্দই স্বভাবতঃ সপ্ত নামে কল্পিত। দশজন ইন্দ্রিয়াধিপতি মনুর পর তাঁহাদের দ্বারা ঐ সপ্ত-জনের উৎপত্তি, কাজেই শুধু কল্পনা কল্পিত নহে ; তাহা বিজ্ঞানের গূঢ় বিজ্ঞানে ব্যবস্থিত। অর্থাৎ, দশ আসিলেই পরে সপ্ত আসিবে, তাই সৃষ্টিক্রমে দশের পর সপ্তের আগমন লিখিত হইয়াছে। দশ কর্ত্তৃক সমুদয় স্থাবর, জঙ্গমাত্মক, বৃহৎ সংসার ও তাহার অধিষ্ঠাতা জীবপর্য্যায় সংসারে আগমন করিয়াছিল। জীবগণের মধ্যে যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও যাহার যে প্রকার জন্মপর্য্যায় তাহা উক্ত সংহিতায় লিখিত আছে,জীবগণের মধ্যে যাহারা জরায়ুজ, তাহারা গর্ভকোষে জন্ম গ্রহণ করে, যথা মনুষ্য,রাক্ষস, পিশাচ, পশু, মৃগ। জন্তু, ও দুই পুংক্তি দন্ত বিশিষ্ট জন্তু, ইহারা সকলেই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষী সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য কচ্ছপ, এবং এই প্রকার স্থলজ নকুলাদি এবং জলজ ভেকাদি, ইহারা অণ্ডজ অর্থাৎ অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দংশ, মশক, যুক, মক্ষিকা, মৎকুন ইহারা স্বেদজ এবং ইহাদের সদৃশ অপরাপর পিপীলিকাদি প্রাণীগণও উষ্মা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। সমুদয় উদ্ভিদ স্থাবর, ইহাদেরও বহুবিধ বিভাগ বর্ত্তমান। ইহারা জীবিত হইলেও ইহারা তমসাচ্ছন্ন। ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং ইহারা সুখ দুঃখও অনুভব করিয়া থাকে।

মনুসংহিতার এই সৃষ্টিপর্য্যায় হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্মা যেরূপ সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, বিরাট যেরূপ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, মনু আদি প্রজাপতি বর্গ সেইরূপ এক একটী লোকের অধি-

পতি। তাই বিরাট পুরুষ, অর্থাৎ তৃতীয় সৃষ্টির পরে মনুর আবির্ভাবের কাল।

মনু আদি দেবতা বা সিদ্ধ মহাপুরুষগণ,হিরণ্যগর্ভরূপ মহা-মনের বা ঈশ্বরের এক একটী চিন্তাকারিণী সত্তা মাত্র। যখন উহা উক্ত মহামনের মধ্যে প্রকটিত হয়, তখন ঐ প্রত্যেক মনন, সেই মহামনের একটী একটী অংশস্বরূপ বলা যাইতে পারে। ঐ বিকশিত মননই, (অর্থাৎ ব্রহ্মার মহা মানস ক্ষেত্রে) এক একটী সৌর জগৎ ও তদন্তর্গত গ্রহ-পৃথিব্যাদি সৃষ্টির এক একটী চিন্তাকারিণী সত্তা। উহাদিগকেই নব প্রজাপতি বা গ্রহাদির সূক্ষ্ম মানস বা এক একটী প্রজাপতি মনু বলা হয়। উহারাই গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সূক্ষ্ম মনোময় মনুতে, সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জৈবী সত্তার সত্তা বর্ত্তমান, সমুদয় সূক্ষ্ম জীবের অস্তিত্ব আবার উক্ত গ্রহদেবতার এক একটী আন্তরিক সত্তা মাত্র। উহাই পঞ্চ-ভৌতিক দেহে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া এক একটী জীব-জন্তুরূপে পরিণত। তাই গ্রহ-দেবতা মনু কর্ত্তৃক স্থূল জীবের উৎপত্তি শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু তাহা হইলেও (অর্থাৎ মনু কর্ত্তৃক) সমুদয় জীবজন্তু সৃজিত হইলে পর যে জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহে সত্ত্ব গুণের বিকাশ না হয়, যাহার মস্তিষ্ক মধ্যে ব্রহ্মের চিন্তা-কারিণী সত্তা বা মানস প্রতিবিম্বিত না হয়, তাহা মানবনামে কল্পিত নহে। তাহা অপর দুই পর্য্যায় মাত্র। যে পর্য্যায়ে দেহধারী জীবের মস্তিষ্ক সত্ত্বময় মানসাম্বু প্রতিবিম্বিত হয়, সেই

পর্য্যায় হইতেই জীব মানবকুলে উত্থিত হইয়া যথার্থ মানব নামে কল্পিত হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায়, প্রকৃত পক্ষে পশুজগৎ হইতে সাক্ষাৎ ভাবে মানবসৃষ্টি হয় নাই। জড় জগতে যেরূপ জড়ীয় উপাদানক্রম পরিবর্ত্তন হেতু শক্তির পরিবর্দ্ধন হওয়ায়, উদ্ভিদ রাজ্যে জীবের বীজ প্রস্তুত হয়, এবং জীবরাজ্যে তাহার বিকাশ হয়, সেইরূপ পশ্বাদিতে জৈবোপাদানক্রম সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইলে, ঐ জীবরাজ্যে মনের বীজ প্রস্তুত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা মানবে অভিব্যক্ত হইলেও, যতক্ষণ ঐ মস্তিষ্ক ভিতরে ব্রহ্মার সত্ত্বগুণজ চিন্তাকারিণী সত্তা বা মানসদেবতার বিকাশ না হয়, ততক্ষণ উহা মানবরাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। তাই পশু হইতে একবারে সাক্ষাৎ ভাবে মানব সৃষ্ট হয় না।

তবে, পশুজগতে ভৌতিক ও জৈবোপাদান সংস্কৃত হইয়া মনোময় কোষ সৃষ্ট্যুপযোগী হইলে, সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রের সত্ত্বগুণ হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবগণ ও তদপেক্ষা উচ্চতর লোকের মানস-পুত্রের তাহাতে বিকাশ হয়। ঐ মানস পুত্রই মহৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। ইঁহারই সাহায্যে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জন্মে জন্মে সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন।

মনুস্মৃতিতে তাই জীবের তিনটী উপাধি দেখা যায়, একটী ভূতাত্মা, একটী মহৎ, ও একটী ক্ষেত্রজ্ঞ যথা :—

যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞ প্রচক্ষতে।
যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ॥

যিনি এই শরীরকে কার্য্য করান, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে, এবং কর্ম্ম প্রবৃত্ত শরীরকে পণ্ডিতেরা ভূতাত্মা বলেন। এবং শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞের অতিরিক্ত মহৎ সংজ্ঞক অন্তরাত্মা অন্তরে নিবাস করেন। ইনিই সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞের সমভিব্যাহারী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, জন্মে জন্মে তাঁহারই সাহায্যে জীব সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন।

মনুর ভূতাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ও মহৎ, এই তিন শ্রেণীতেই সমুদয় সৃষ্টি অভিব্যক্ত। ভূতাত্মা শব্দ পারিভাষিক সংজ্ঞা মাত্র। বৃক্ষ পর্ব্বত ধাতু মৃত্তিকা ইত্যাদি হইতে সামান্য বালুকা কণায় যে আত্মা নিবসতি করেন তাহাই ভূতাত্মা। তাই যাহাকে সচরাচর জড় বলা যায়, তাহা প্রকৃত পক্ষে জীবশূন্য নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া জীবে যে ক্রিয়াশীল প্রাণময় কোষের (যাহা পঞ্চ ভূতের রজোগুণ হইতে উদ্ভূত) বিকাশ আছে, উহাতে তাহা নাই। অবশ্যই সৃষ্টিক্রমানুসারে, কোষে কোষে উদ্ভব, অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগতের ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মানুযায়ী জড় পদার্থ উদ্ভিদে, উদ্ভিদ কীট-পতঙ্গে, কীট-পতঙ্গ পশ্বাদিতে বিবর্ত্তিত ও ক্রমে জড় রাজ্যের অস্ফুট জীবত্ব জীবরাজ্যের প্রাণময় কোষে অভিব্যক্ত হয়। বস্তুর পরিবর্ত্তন উহার আভ্যন্তরীণ আকর্ষণ-বিকর্ষণ হইতেই আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে, উহাদের বিভিন্ন গুণ উৎপন্ন হয়। ঐ বিভিন্ন গুণের কারণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ হইতে বস্তুর আভ্যন্তরীণ তেজের স্ফুরণ ও বিকীরণ হয়। ঐ বিকীরণ হইতেই বস্তুর অণুসকল বিশ্লিষ্ট হইয়া কঠিন বস্তুকে দ্রবত্বে, দ্রবকে আবার বাষ্পে, বাষ্পকে

আবার অণু-পরমাণুতে পরিণত করে। উহাই, অর্থাৎ তেজই ক্রমবিকীর্ণ বহিস্ফুরিত হইয়া শীতলভাব ধারণ করিলে, ক্রমশঃ শীতল ও ঘনীভূত হইয়া মেঘ ও জলাকারে পরিণত হয়। আবার ঐ জলই কাঠিন্যে পরিণত হয়। আভ্যন্তরীণ তেজই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বা সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মূল কারণ। ঐ তেজ আবার গতি হইতে স্ফুরিত হয়। ঐ গতিকে আকাশীয় প্রবাহ বা পরম পিতার মহানিঃশ্বাস বলা হয়। গতি হইতেই, আকাশীয় পরমাণু মধ্যে কম্পন ও তাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং উহাই বায়ু কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া ধ্বনিত হয়। কম্পন হইতেই পরমাণু সকলের অভ্যন্তরে ঘর্ষণ উপস্থিত হয়, ঐ ঘর্ষণ হইতেই তেজ ও উষ্ণতার স্ফুরণ, এবং পরে জ্যোতি বিকশিত হয়, উহাই রূপ বা তেজরূপ পিতৃশক্তি। গতির দ্রুততায় প্রথমাবস্থায় বস্তুর আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণও অস্পষ্ট অনুভূত হয়। সুতরাং তেজ ও জ্যোতির সম্যক বিকাশ হয় না। তাই সেই অবস্থায় ঐ বস্তু জড় নামে কল্পিত, অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তেজ সম্যক বিকাশ প্রাপ্ত না হওয়ায়, বস্তুর বিকাশ হইতে পারে না। তাই উহা ঘন পরিবর্ত্তনে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতে হইতে শেষে উদ্ভিদে আসিয়া, উহার উপাদানসকল ক্রমে অধিক রূপান্তর ও জল মৃত্তিকার সংযোগ হেতু ক্রিয়াশক্তি অধিক স্ফুরিত হওয়ায়, ঐ ক্রিয়াশক্তির অপেক্ষাকৃত ধীরভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। জল হইতে বাষ্প, বাষ্প হইতে মেঘ হইয়া তাহা অনতি-বিলম্বে বর্ষিত হইয়া যায়। কিন্তু উদ্ভিদ রাজ্যে আসিয়া

উহার ক্রিয়া অধিকতর দীর্ঘক্ষণস্থায়িত্ব লাভ করে। এবং উহা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াদ্বারা ক্রমশঃ সংস্কৃত হওয়াতে, উহাতে ক্রিয়াশক্তি অধিকতর স্থায়িত্ব লাভ করিয়া, ক্রমশঃ উহাকে ক্রমিক উন্নতিতে লইয়া আইসে। উহার গতি বা তৈজস শক্তি, ক্ষিতিজাতীয় জলীয়তত্ত্বের উপাদানে ক্রমশঃ সংঘর্ষিত হইতে হইতে উহা হইতে তৃণ-গুল্মাদির বীজ উৎপন্ন হয়। ঐ বীজ ক্রমিক উপাদানে বৃক্ষে আসিয়া স্থায়িত্ব ভাব ধারণ করে।

ঐ বীজই কোষাকারে শ্রেণীবদ্ধ হয়, উহাকেই হিন্দুশাস্ত্র কোষস্থ ব্রহ্ম বা পিতৃশক্তি বলিয়াছেন। উহা এতাদৃশ্য সূক্ষ্ম, যে উহাকে দর্শন করা চর্ম্মচক্ষুর অসাধ্য। যাহাহউক, ঐ জৈবী উপাদান ও উদ্ভিদের সংঘর্ষণে, যে স্বেদজ কীট-পতঙ্গাদির উদ্ভব হয়, তাহাতে গতি ও জ্যোতির স্ফুরণ অধিক মাত্রায়, তাই উহার ক্রিয়া উদ্ভিদ জগত হইতে স্পষ্টতর। কিন্তু তখনও গতি অতিদ্রুতভাবে চালিত হয়, তাহাতে উহার সংযুক্ত দেহে জৈবীশক্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না, উহার জীবিত কালও তাই অত্যল্প পরিমাণে পরিমিত হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় মৃত্তিকা, জল ও বৃক্ষ পত্রাদিতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু সমষ্টি বর্ত্তমান আছে, উহারাই ক্রমশঃ উক্ত ক্রিয়ার সংকর্ষণে পুষ্টি ও পূর্ণতা লাভ করিয়া, শেষে অধিক ক্রিয়াশীল হইয়া স্রোতআকারে নিবদ্ধ হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হয় এবং দৈহিক সূক্ষ্ম যন্ত্ররূপে বিবর্ত্তিত হইয়া, ভৌতিক দেহ নির্ম্মাণ

করিয়া লয়। ঐ জীবাণু-গ্রথিত সূত্রবৎ সূক্ষ্ম দেহস্থ ক্রিয়া-শক্তিই প্রাণময় কোষ নামে শাস্ত্রে উক্ত। ঐ প্রাণময় কোষই গতি ও জ্যোতির সংকর্ষণ-ক্ষেত্র, উহাই আত্মার ভৌতিক ক্ষেত্র বা বাসস্থান। উহার ক্রিয়াতেই জীবের জীবত্বের অভিব্যক্তি। দেহ, ইন্দ্রিয়, ও দৈহিক যন্ত্রনির্ম্মাতা জীবাণু সমষ্টিই বা উহার ক্রিয়া-স্রোতই মনুষ্যত্বের ভূতাত্মা। দর্শন শাস্ত্রে উহাই প্রাণময় ও অন্নময় কোষ নামে বর্ণিত। ঐ স্ফুরিত প্রাণময় কোষযুক্ত অন্নময় কোষই জীব-জগতে বিকাশ। জড়রাজ্যের যাহা আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, তাহা গতি ও তেজের ফল হইলেও, উহাই ব্যষ্টি ও সমষ্টি বস্তু মাত্রেরই স্ব স্ব গুণানুযায়ী এক একটী ভাবের উদ্দীপক ও প্রকাশক হয়। জড়রাজ্যে চৈতন্যের অবিকাশ হেতু উহা আকর্ষণ ও বিকর্ষণেই পরিচ্ছন্ন। কিন্তু জীবজগত সমধিক চৈতন্যময় বলিয়া, উহাতে উহা অনু-রাগ ও দ্বেষভাবে অভিব্যক্ত। উপাদানের গুণানুসারে ইহাই আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহে পরিণত হয়। এই বৃত্তি-গুলি ভূতাত্মার, তাই ইতর জন্তুগণ সর্ব্বদা উহার বৃত্তিবশে পরি-চালিত হয়। কিন্তু মানবজগতে যথায় মনোময় কোষের বিকাশ, তথায় উহা মনোময় কোষের ইচ্ছানুভূতি ও চিন্তার ছায়ার আসিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত দশা প্রাপ্ত হয়। আবার উহাই মনোবুদ্ধির ছায়ায় নিপতিত হইয়া, ভিন্ন রূপে অর্থাৎ জ্ঞান তত্ত্বে আসিয়া সমধিক পরিচ্ছন্ন হয়। কিন্তু উহার মূল অধিষ্ঠান ঐ অন্নময় ও প্রাণময় কোষস্থ ভূতাত্মায়।

এক্ষণে কোষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন, যাহা লইয়া জড়, উদ্ভিদ ও জীবে প্রভেদ। শাস্ত্র বলেন, পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ হইতে সমুদয় সংসারের ব্যাপার নিষ্পন্ন। এই পঞ্চীকরণ কাহাকে বলা হয়? প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, তদনন্তর এই দ্বিধা বিভক্ত অংশের এক এক অংশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই প্রত্যেক চারি অংশের স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য চারিভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অংশের সহিত এই চারিভাগের এক এক অংশ যোগ করিলে আকাশাদি পঞ্চভূত প্রত্যেককেই পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভাগ করা হয়। ইহাকেই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ বলে।

এই পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। এবং তাহাতে ভূর্লোকাদি পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবনের বিকাশ হয়। সেই সকল ভুবনে তথাকার ক্রম অনুসারে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসকল এবং সেই সেই ভোগের অধিকারী জরায়ুজ ইত্যাদি অনেক প্রকার শরীর উৎপন্ন হয়। ভূতভাবন ভগবান এইরূপে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন।

পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে, পঞ্চ ভৌতিক, স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকে অন্নময় কোষ বলে। ঐ কোষ স্থূল অন্ন পানাদির দ্বারায় বর্দ্ধিত হয়। সপ্তদশ তত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (যাহা আকাশাদি পঞ্চ ভূতের রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয় যথা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থের কার্য্যকরী শক্তির

অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের) উৎপত্তি হয়। এবং ঐ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টি রজোগুণের সার সংগ্রহ হইতে প্রাণের বিকাশ হয়। ঐ প্রাণ প্রবৃত্তি আবার বৃত্তিভেদে পঞ্চ প্রকার যথা, নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, গ্রহণশক্তি, পরিপাকশক্তি, রক্তসঞ্চালন-শক্তি, উদ্গার ও মলমূত্রত্যাগশক্তি, ঐ সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জীবনী শক্তির সহিত যে ক্রম বর্ত্তমান কেন্দ্র তাহাকেই প্রাণময় কোষ বলা হয়। কিন্তু ইহার সহিত আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণজ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা আকাশ শব্দগুণের আধার, অতএব আকাশের সত্ত্বগুণ হইতে (অথবা চিদ্‌বিকাশিনী শক্তি) কর্ণেন্দ্রিয় (যদিও এই কর্ণ ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য কর্ণ নহে, কর্ণের শব্দ গুণগ্রাহিকা শক্তি) বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, রসের সত্ত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয় ও ক্ষিতির সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। এবং ঐ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি সত্ত্বগুণের সার সংগ্রহ হইতে জীবের মন-বুদ্ধিযুক্ত অন্তঃকরণের বিকাশ হয়। ঐ অন্তকরণ যোগেই প্রাজ্ঞ আত্মা, সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ অন্তঃকরণের বীজই কারণশরীর, উহা হইতেই কোষ পর্য্যায়ের আনন্দময় কোষের বিকাশ, কিন্তু যতক্ষণ তমঃপ্রধান সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের মলিন সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ বুদ্ধির বিকাশ না হয়, ততক্ষণ উহাতে ভোক্তৃত্বাভিমানী চিত্তেরও স্ফুরণ হয় না। ঐ বুদ্ধিই স্বয়ং কর্তৃত্বাভিমানী হয়। ঐ কর্তৃত্বাভিমানী অহংবৃত্তির আনন্দময় কোষেই বিকাশ ক্ষেত্র। উহার সহিত, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময়কোষের এবং

লোভ মোহ বৃত্ত্যাদি সহ সঙ্কল্পাত্মক মনোময় কোষের বিকাশ হয়।

এই সপ্তদশতত্ত্ব লইয়া লিঙ্গশরীর। লিঙ্গশরীরের মধ্যগত পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন বাক্ পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু সমন্বিত যে পঞ্চ প্রাণ আছে তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশের কার্য্যস্বরূপ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমন্বিত যে সংশয়াত্মক মন, তাহাকে মনোময় কোষ বলে। এই মনোময় কোষেই ইচ্ছাশক্তির অনুভূতি হয়। এবং ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমানে যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাহাকেই বিজ্ঞানময় কোষ বলা হয়। ইনিই কর্ত্তা স্বরূপে জ্ঞানশক্তির বিকাশ করেন। ইহা ছাড়া পূর্ব্বোক্ত কারণশরীরে যে অবিদ্যা বিদ্যমান আছেন সেই অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ প্রীতি আমোদ প্রভৃতি যে কতিপয় বৃত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের সহিত মিলিত যে সত্ত্বগুণ তাহাকেই আনন্দময় কোষ বলা হয়। আত্মা এই প্রত্যেক কোষের অভিমান করিয়া থাকেন, এই জন্য আত্মাও প্রতি কোষের সহিত কোষ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। আত্মা যখন অন্নময় কোষের অভিমানী হন, অর্থাৎ যখন স্থূল দেহে তাঁহার "আমি ভাব" উপনীত হয়, তখন তিনি অন্নময়। যখন তিনি প্রাণময় কোষের অভিমানী হন, তখন তিনি প্রাণময়। সেই আত্মা মনোময় কোষের অভিমানী হইলে, তাহাকে মনোময় বলা হয়। উক্ত আত্মা আবার বিজ্ঞানময় কোষের অভিমানী হইলে

তিনি বিজ্ঞানাত্মা নামে কথিত হন। ঐ আত্মাই শেষে আনন্দময় কোষে আনন্দময় নামে উক্ত হইয়া থাকেন। এই রূপে দর্শনশাস্ত্রের মতে একই আত্মা পঞ্চ অভিধানে অভিহিত হন। আবার ঐ পঞ্চম উপাধি পরিবেষ্টিত আত্মাই স্মৃতিশাস্ত্রে ত্রি অভিধানে অভিহিত হন। ঐ ত্রি অভিধানেই মনুস্মৃতির ভূতাত্মা মহৎ সংজ্ঞক ও ক্ষেত্রজ্ঞ।

তমোগুণ হইতে জড়াকাশে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের বিকাশ হয়। ঐ পঞ্চভূতের ত্রিগুণ হইতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত। উহা হইতেই সমুদয় জীব-জন্তুর বিকাশ। পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ হইতেই স্থূলদেহের উৎপত্তি। ইহা ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ পরস্পরের সম্মিলিত অবস্থা হইতে উৎপন্ন। চর্ম্ম মাংস অস্থি ইত্যাদি কঠিন ক্ষিতিজাতীয়। পিত্ত জঠরের অগ্নি ইত্যাদি তেজ জাতীয়। ফুসফুসের ক্রিয়া, স্নানবীয় গতি ভুক্ত দ্রব্যের পাকক্রিয়াগতি ও দৈহিক সমুদয় গতি বায়ুজাতীয়। আর শরীরমধ্যে যে সমুদয় শূন্য স্থান আছে, উহাই আকাশ-জাতীয়। আকাশে শব্দের উৎপত্তি বলিয়া আকাশ ভূতমধ্যে গণনীয়, নতুবা আকাশ স্থূলভূত মধ্যে গণনীয় নহে। আকাশেই সূক্ষ্ম তন্মাত্র অবস্থিত। ঐ পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পরমাণুপুঞ্জ হইতেই স্থূল পঞ্চভূতের বিকাশ এবং উহার পঞ্চীকরণ হইতেই সমুদয় স্থূলদেহের উৎপত্তি। কিন্তু লিঙ্গদেহের বিকাশ ব্যতীত কদাচ স্থূল দেহ উৎপন্ন হইতে পারে না। লিঙ্গদেহেই স্থূল দেহের সর্ব্বস্ব, স্থূল দেহ, লিঙ্গ-দেহের আবরক মাত্র। তথাপি

যে অর্থে সচরাচর আবরণ শব্দ ব্যবহৃত হয়, এ স্থলে তাহা প্রযোজ্য নহে। এখানে আবরণ শব্দ ওতপ্রোতভাবে সংমিশ্রণকেই বলা হয়। অর্থাৎ স্থূল দেহ লিঙ্গ-দেহের সহিত, আবরণ আবার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, যেরূপ বস্ত্রের সহিত সূত্রের ওতপ্রোত সম্বন্ধ, তেমনি লিঙ্গদেহের সহিত স্থূল দেহের। লিঙ্গ-দেহের অভাব হইলে, স্থূলদেহ তৎক্ষণাৎ জীবন শূন্য হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে একই দেহের উপর দর্শনশাস্ত্র পঞ্চম কোষ ও স্মৃতি কেন ত্রি-পর্য্যায় স্বীকার করিলেন। তাহা হইলে দেখিতে হইবে, ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? দর্শনের অন্নময় ও প্রাণময় কোষ বলিয়া যে দুইটি পর্য্যায় বর্ত্তমান। স্মৃতির তাহাই ভূতাত্মা। উহার মানোময় ও বিজ্ঞানময় বলিয়া যাহা উক্ত, মনুর তাহাই মহৎ, এবং দর্শনের আনন্দময় কোষই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কল্পিত।

প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, লিঙ্গদেহেতে দুইটি পর্য্যায় দেখা যায়, প্রথমটি ক্রিয়াময়, দ্বিতীয়টী জ্ঞানময়। প্রথম ক্রিয়াময়-স্তরই প্রাণময় কোষ, দ্বিতীয় জ্ঞানময় স্তরই মনোময় ও বিজ্ঞান-ময় নামে অভিহিত। তাই মনুতে ত্রি আত্মা স্বীকৃত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে জীবপর্য্যায় হইতে একবারে মানবের আগমন হইতে পারে না। যত দিন জীবের মস্তিষ্কে ব্রহ্মের চিন্তাকরী সত্তার প্রতিবিম্ব না পড়ে, ততদিন উহা মানব-কুলে উত্থিত হইতে পারে না। উপনিষদে এতৎসম্বন্ধে বহু-

বিধ আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে যে, পশুদিগের ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইলে দেবগণ তাহাতে বিকাশ হইতে অস্বীকার করায়, পরে মানবদেহ নির্ম্মিত হয়। ঐ মানবদেহেই সত্ত্বগুণজ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিকাশ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় প্রাণময় কোষ, আত্মার ক্রিয়াশক্তি-জ্ঞাপক হইলেও ইহাতে সত্ত্বগুণের গুণজ্ঞ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবির্ভাব হয় না। অর্থাৎ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে হইলে ইহা ধারণা করিতে হইবে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকল প্রাণময় কোষের অন্তর্গত হইলেও, ইহার প্রকৃত সত্ত্ব গুণজ অংশ ও তৎ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞানানুভূতিপ্রকাশক অধিষ্ঠাতৃ দেববৃন্দ সকলেই সত্ত্ব-গুণোদ্ভব, তাই পশুজগতে প্রাণময় কোষও অসংস্কৃত মনোময় কোষের বিকাশ থাকিলেও, তাহাতে সত্ত্বগুণজ ব্রহ্মার মানসাত্মু প্রতিবিম্বিত হয় না, বলিয়া পশুজগত হইতে একবারে মানব বিকশিত হয় না। প্রকৃতির অন্তরে যে সমষ্টি চৈতন্য শক্তি বা ঈশ্বর আছেন, তাঁহার ব্যষ্টি অংশ সর্ব্বজীবে অভিব্যক্ত হইয়া সকলের নিয়ামকপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ভৌতিকজগতে উহার যথার্থ-বিকাশ হয় না। মানবেই ইহা কতকাংশে বিকশিত। তাই ভৌতিক জৈবী উপাদান সংস্কৃত হইয়া মনোময় কোষ সৃষ্ট্যপ-যোগী হইলে, যখন তাহাতে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় তখন উহাতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ ও উচ্চতর লোকের মানসপুত্র বিকশিত হইয়া, উক্ত মস্তিষ্ককে মানবকুলে উত্থিত করিয়া দেন। অর্থাৎ মহামনের প্রকৃত আমিজ্ঞান, মানবেই যথার্থ বিকশিত। মনুষ্য

ছাড়া অপর জীবে তাহার বিকাশ হইতে পারে না। ত্রিগুণের প্রথম গুণ তম, তাহা মৃত্তিকা প্রস্তরাদিতেই অভিব্যক্ত। রজোগুণ জীবজগতের সম্পত্তি, তাই, প্রাণময় কোষ উহাতে বিকশিত। মনুষ্য-জগতেই কেবল সত্ত্বগুণের বিকাশ। তাই সত্ত্বগুণজ দেববৃন্দ মানবেন্দ্রিয়ের অধিকারী, আবার মানবমধ্যেও ত্রিবিধ ভেদ বর্ত্তমান। ইহাদের ভিতরেও তম রজ ও সত্ত্বের বিকাশ। তবে যে তম, রজ, জড়জগতে ও জীবজগতে বিদ্যমান, মনুষ্য-জগতে তাহা নাই। মনুষ্যজগতে গুণভেদ থাকিলেও তাহাতে সত্ত্বগুণের অভাব নাই। সত্ত্বগুণের অভাব থাকিলে, জীব মনুষ্যজগতে উত্থিত হইতে পারে না। তাই পশুজগতে প্রাণময় কোষের বিকাশ হইলেও, যতক্ষণ না তাহাতে জ্ঞানের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উহা মানবজগতে আসিতে পারে না। এই স্থানে আর্য্যঋষিগণের ক্রমবিকাশের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সংঘর্ষণ উপনীত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রকৃতির বহিরঙ্গ মাত্র অবলোকন করিয়াছেন, আর আর্য্যঋষি তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের মতের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

যাহা হউক, গ্রহদেবতা মনুর সৃষ্টিতে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানবে ক্ষিতির সপ্তগুণ নিহিত, উহা তাহার নিজস্ব। আর উহার সহিত যে ঊর্দ্ধতন সপ্তলোকের সপ্তগুণ বিদ্যমান, তাহা তাহার পরস্ব সম্পদ। কিন্তু উভয়ের সহিত উভয়েরই সতত সংঘর্ষণ উপনীত হয়। তাই স্থূলজগৎ-নিবাসী জীবের

মন বুদ্ধি ও দেহের উপর উক্ত লোকদেবতা ও উচ্চলোক-নিবাসীদিগের প্রভাব সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় মানব তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর লোকের গ্রহদেবতা ও তাহাদের অধিকৃত শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। আবার মানব ইচ্ছা করিলেও তাহার অন্তরস্থ পর্য্যায় উন্নত ও সংস্কৃত করিয়া তৎ-লোককে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারে। মনুষ্য-দেহেই সমুদায় পর্য্যায় ব্যবস্থিত। জড়ের জড়ত্ব জীবের জীবত্ব, ও মানবের মানবত্ব সমুদয়ই মানবে! বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যতলোক ও যত জীব বিদ্যমান, তৎসমুদয়ের সূক্ষ্মাংশ লইয়া মানবদেহ গঠিত।

মানবের সপ্তকোষে সপ্তমানস পুত্ররূপ গ্রহদেবতা। দশ ইন্দ্রিয় প্রাণপদবাচ্য এবং উক্ত মুখ্য মহাপ্রাণের অন্তর্গত তাহা-তেও যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারাও দেবপদবাচ্য। আবার সত্ত্বগুণজ মনোবুদ্ধিও চিত্ত-অহংকাররূপ মনোবৃত্তির পরি-চালকগণও দেবতা বা উচ্চলোকনিবাসী মানসপুত্র অথবা জগদ্‌বিকাশকারী মহা. মানসান মনরূপ তাহাদের পরিচালক পদে প্রতিষ্ঠিত। মনরূপ ব্রহ্মার মানসপুত্র ইহাতে অভিব্যক্ত বলিয়া চতুর্থ সৃষ্টি মনুর রাজ্যনামে কথিত। মনুর যাহা কিছু তৎসমুদয় মানবেই প্রয়োজ্য। মানবের শিক্ষা, দীক্ষা, ক্রিয়া, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, গরিমা, সমুদয়ই মনু হইতে ব্যবস্থিত।

বেদের যে দশ মণ্ডল, বিরাটের বিস্তৃত দেহে ও তদন্তর্গত শক্তিসমূহে ব্যবস্থিত। তাহাই মনুর দশ বিধিতে পরিণত

হইয়া, মানবের দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহে ব্যবস্থিত। বিরাটের ভূতাত্মা, জীবাত্মা ও মানসাত্মা বিদ্যমান, মানবেও তাহা অভিব্যক্ত! বিরাটের ত্রি-পর্য্যায়ের দেবশক্তিগণ, মনুর সৃষ্টিতে ঋষি বা রশ্মিরূপী দেবতা নামে অভিহিত হইয়া, দেহের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে বিদ্যমান। বেদের অগ্নি ও সোম, মনুর সৃষ্টিতে পিতৃশক্তি (শুক্র) ও মাতৃশক্তিতে (ক্ষেত্রে) পরিণত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কারণজগতে সত্ব রজ তমোগুণের বিকাশ হইলে, এবং রজোগুণ কর্তৃক দ্রবীভূত কারণবারি সূক্ষ্ম তমোগুণের উপাদান বা ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত হইলে সূক্ষ্ম দেহের উৎপত্তি হয়। কার্য্যজগতে জলীয় তত্বের সহিত ক্ষিতিজাতীয় তত্বের সংযোগ হইলে, স্থূল দেহের উৎপত্তি হয়। চিত্তাকাশস্থিত চিদ্বীজ ক্ষেত্রস্থ হইলে, জীব জন্তু উদ্ভিদাদির উৎপত্তি হয়। তাহাতেই বলা যায়, জলই পিতৃশক্তি ও ক্ষেত্রই মাতৃশক্তি। জলই শুক্ররূপে বিবর্দ্ধিত ও শোণিতই ক্ষেত্ররূপে বিকশিত।

মনুর দশেন্দ্রিয়যুক্ত সৃষ্টিতে দশ সংস্কার বর্ত্তমান। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুতে ইহা পর্য্যবসিত। ইহাই শেষে দশ কর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহারই ক্রমপরম্পরা ধরিয়া অধুনা সমুদয় ধর্ম্মকাণ্ড নির্ব্বাচিত। বিরাটের লোকদেবতারা, স্মৃতিতে দেহদেবতা, অধুনা তাঁহারাই আবার গৃহদেবতারূপে পরিগণিত। ত্রি-তত্বই তেত্রিশ কোটীর মূল। জগদতীত নির্গুণ ব্রহ্মের আত্মস্থ, আত্মজ্ঞ ও আত্মানন্দই চতুর্থ সৃষ্টিতে

তেত্রিশ কোটীতে পরিণত। চতুর্থাবস্থাই সৃষ্টির চরম অবস্থা, ইহাই প্রবৃত্তিমার্গের শেষ সীমা। সূক্ষ্ম পিতৃশক্তি এইস্থানে আসিয়া, মাতৃশক্তিরূপিণী আবরণময়ী অবিদ্যা কর্তৃক আবরিত। এইস্থান হইতে স্থূলসৃষ্টি, আবার স্ব-স্বভাবরূপ সূক্ষ্মে যাইতে প্রস্তুত হয়। তাই ইহা হইতে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয় নিবৃত্তিমার্গের জন্য। ব্রহ্মার সমুদয় সৃষ্ট সম্পত্তি এই স্থানে আসিয়া একীভূত। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে ও তৎ সেওয়ায় অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রে যে সমুদয় তত্ত্ব ও লোক বর্ত্তমান, তৎসমুদয় মানবের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে বিদ্যমান। মানব সকলের সহিত নিজস্ব ও পরস্ব ভাবে সতত সংমিশ্রিত। এই সকল গ্রহগণ মানবের দেহ ও মনের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন, তাহা হিন্দুঋষিগণ সবিশেষ অবগত ছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, মানব ঈশ্বরের ছায়া বা সমুদয় সৌর-জগতের আধ্যাত্মিক ও বাহ্য ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বিশেষ। সেই জগতস্থ কি বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত পদার্থ ও শক্তি আংশিক-ভাবে মানবে বিদ্যমান। সৌরজগৎস্থিত সপ্ত গ্রহের অনুকরণে মানব দেহাভ্যন্তরে ষট্‌চক্র, ও মস্তিষ্কে সহস্রদল পদ্ম আছে। স্বভাবতঃ মানব উক্ত সপ্তগ্রহের সপ্তটি জন্ম গ্রহণ করিয়া কোটী কোটী জন্মের পর (অর্থাৎ হিন্দুমতে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর গতে) নির্ব্বাণ-রূপ পরমপদ লাভ করিতে পারে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে মানব ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে। মানব আপনার অদম্য চেষ্টায় সপ্তগ্রহ ও চতুর্দ্দশ

ভুবন ভ্রমণ এক জন্মেই অনেকটা ভোগ করিতে পারে, অর্থাৎ তাহার দেহাভ্যন্তরে যে কুণ্ডলিনী-শক্তিরূপা মহা জীবনী শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাকে জাগরণরূপ সক্রিয় অবস্থায় আনিতে পারিলে,তাহা হইতে অপর ষট্‌চক্রস্থ তড়িৎপ্রবাহকে অনায়াসেই জাগরিত করিয়া, সপ্তজন্মের ভোগ এক জন্মেই ভোগ করিয়া লইতে পারে। তবে ইহাতে কতকটা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অনুসরণ করে বটে। এ বিষয় সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে বহুবিধ বর্ণনা আছে। এ স্থলে তদ্বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র এথানে বক্তব্য যে, মানবদেহের সহিত উক্তলোক সমূহের ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া, উহাদের জড়দেহাশ্রিত আকর্ষণ ও বিকর্ষণে মানব ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কতকটা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের বশতাপন্ন হইয়া পড়ে। মানবসমুদয় সৌরজগৎসমন্বিত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের এক একটী আদর্শবিশেষ। চারি পর্য্যায় সমন্বিত, চারি তত্ত্ব মানবে অভিব্যক্ত। কারণ জগতের অব্যক্ত চিন্তা, সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম আদর্শ, স্থূল জগতের পঞ্চভূতাত্মক জড়শক্তিবেষ্টিত স্থূলাধার সমুদয়ই মনুষ্যে প্রতিফলিত। চতুর্থ সৃষ্টির পরম সম্পদ মানব। মনু আদি লোকদেবতাদিগের যাহা কিছু বিকাশ, তৎসমুদয়ই মানবে প্রয়োজ্য। তাঁহাদের রীতি, নীতি, ব্যবস্থা নিয়মাবলি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানবের অনুগামী। এই মানবের স্থূল পঞ্চভূতাত্মক দেহে ও মনের উপর যাহার অখণ্ড প্রভুত্ব, অর্থাৎ যিনি জড়রাজ্যের নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে সতত

আপন মহিমায়, স্থির, ধীর, ও নিত্য ভাবে বর্ত্তমান, তিনিই মহাদেব নামে প্রসিদ্ধ।

এক্ষণে চতুর্থ পুরুষ, অথবা ব্যক্ত সৃষ্টির ভোগাশ্রয়া পঞ্চভূতাত্মক তমঃপ্রধানা প্রকৃতি যুক্ত পুরুষের বিষয় কিঞ্চিত বলিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। বিশ্বের সংকর্ষণ শক্তিকেই হিন্দুগণ সাধারণতঃ মহাদেব নাম প্রদান করেন। সংকর্ষণ শক্তির কার্য্য বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করা, অর্থাৎ স্থূলকে বিদারিত করিয়া সূক্ষ্মে আনয়ণ করা, আবার সূক্ষ্মকে আকর্ষণ করিয়া স্থূলে পরিণত করা। কল্পাতীতে যখন বিগত জগৎ তাহার কারণ শক্তিতে সম্মিলিত হইয়া, একাকার অবস্থাপন্ন হইয়া মহাকালের নিভৃত কোলে বিশ্রাম লাভ করে, তখন তাহার ব্যক্তত্বের নিদর্শন, সম ও বিষম, অর্থাৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি, তাহার অন্তস্থ গুহ্যতেজে বিরাম প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থা সেই সৃষ্টির প্রাক্‌কালে যে শক্তি বলে গুহ্যতেজের অস্তিত্ব হেতু, আবার ঐ মিলিত অবস্থা অর্থাৎ মহাকালের মহা-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহাতে সম ও বিষম দুইটি শক্তির বিকাশ হয়, তাহাই সংকর্ষণ। যখন সংকর্ষণশক্তি ঐ মিলিত অবস্থাকে পৃথক করিয়া ফেলে, তখন ঐ পৃথক অবস্থাকে আকর্ষণ, বা একাকারের ন্যায় অবস্থাপন্ন করিয়া স্বীয় কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া লয়। উক্ত কেন্দ্রকে শাস্ত্র মহত্তত্ত্ব বলেন। বৈজ্ঞানিক মতে মহত্তত্ত্বই মহাকর্ষণ বা সৃষ্টিকারী শক্তি। আর উহার অভ্যন্তরস্থ তেজই পালনী শক্তি, উহাকেই বিশ্বের জীবন বলা হয়। আর যে শক্তি কর্ত্তৃক এই সংযোগ-

শক্তি বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহাকেই সংহার শক্তি বলা হয়। সংকর্ষণ-শক্তি বিয়োগ-শক্তি হইলেও, ঐ সংকর্ষণ-শক্তিই সৃষ্টি কার্য্যের প্রথম সহায়। উহার কর্ষণ-শক্তি হইতেই একাকার মহা-ভূত কর্ষিত হইয়া, তাহাতে আবার নবকল্প রোপিত হয়। যেমন ভূমি কর্ষিত হইয়া শ্লথ না হইলে, তদঙ্ক নিক্ষিপ্ত বীজের সহিত উহার সমাকর্ষণ হয় না, সেইরূপ সংকর্ষণ-শক্তি হইতে মহাভূত কর্ষিত না হইলে, তাহাতে মহত্তত্ত্বাদি কারণ সত্তার বিকাশ হয় না।

এই প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য বিজ্ঞান ও দর্শনের ঐক্য সাধন করা। অনেকের মনে এইরূপ ধারণা আছে, যে বিজ্ঞান দর্শন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির, অর্থাৎ যেখানে বিজ্ঞানমত স্থাপন হইবে, সে স্থলে দর্শন কখন দর্শন দান করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে কত দূর সত্য, তাহা বলা যায় না। জগৎ যখন এক, তাহার নিয়মাদিও যখন এক, তখন বিজ্ঞান ও দর্শন, অর্থাৎ সংকর্ষণ ও আকর্ষণ তত্ত্ব, এক কেন না হইবে? সংকর্ষণের কার্য্য কর্ষণ করা, বিজ্ঞানের দ্বারা সমুদয় বস্তু কর্ষিত হয়, সে জন্য বিজ্ঞান সাধারণতঃ সংকর্ষণ নামে খ্যাত, আর দর্শন সমস্তকে আকর্ষণী শক্তির ন্যায় একাকার ভাবাপন্ন করিয়া আপনার আয়ত্তে আনিয়া, তাহাতে আপন ভাবে মত স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়। ভারতবর্ষ আস্তিকপ্রধান দেশ, সে জন্য ইহাতে খণ্ডন, অর্থাৎ কর্ষণ কখন স্থায়ী ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয় না। স্থাপনকেই এই প্রদেশ ধর্ম্মপদ বাচ্য করেন। সে জন্য খণ্ডনযুক্ত

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এ স্থলে নাস্তিক আখ্যায় আখ্যাত হয়। কিন্তু যেরূপ কর্ষণ নহিলে বীজ রোপিত হয় না, সেই রূপ বিজ্ঞান যুক্ত তত্ত্ব ব্যতীত, কখন দর্শনরূপ ধর্ম্মবীজ বপন করা যায় না। সেই জন্য এই প্রবন্ধটি একবার করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে ও একবার করিয়া দার্শনিক ভাবে ব্যাখ্যাত করা হইতেছে। যখন বৈজ্ঞানিক ভাবে বলা হইতেছে, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণুরূপী দেববর্গকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, তন্মধ্যস্থ তত্ত্বসমূহকে শব্দগতি ও জ্যোতি নাম প্রদান করা হইতেছে। আবার যখন দার্শনিক মতে তাহাকে স্থাপন করা হইতেছে, তখন আবার ঐ তত্ত্বকে উপাস্য দেবতা পদে রাখিয়া, দূর হইতে বিশ্বাসভরে প্রণাম করা হইতেছে। সেই জন্য ইহা অনেকটা বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় তত্ত্ব হইতে প্রসূত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হিন্দুঋষিগণ বিশ্বের সংকর্ষণ, অথবা বিকীরণ শক্তিকেই মহাদেব আখ্যা দান করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বত্রই চতুর্থাবস্থায় অবস্থান করেন। তাই সৃষ্টির চতুর্থ পর্য্যায়ে ইহাঁর নিবাস। সৃষ্টি যে অবস্থায় আসিয়া তাহার সমুদয় সম্পত্তি, ব্যক্ত-পদে বিকশিত করিয়া, স্থূল দেহে মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়, সেই অবস্থা হইতে সৃষ্টি আবার ক্রমশঃ যে অবস্থায় উত্থিত হইতে থাকে, তাহাকেই সাধুগণ নিবৃত্তি মার্গ কহেন। এই নিবৃত্তি মার্গের দরজায় যে পুরুষ অবস্থান করেন, তিনিই বিশ্বের সেই সংকর্ষণ শক্তি। সংকর্ষণ শক্তিই সৃষ্টির ব্যক্তত্বের প্রধান কারণ। যে শক্তি হইতে সাম্যভাব বিদূরিত হইয়া বৈষম্যের

প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাই সংকর্ষণ। তৃতীয় পর্য্যায়ের কারণ-প্রবাহস্থিত সূক্ষ্ম চিদ্বিম্বই, জগৎ-উৎপত্তির গুহ্যতেজের গুহ্য কণিকা, অথবা বিকীরিত অবস্থা। ঐ নিরাকার চিদ্বিম্বই, কার্য্য জগতে জলীয় তত্ত্বের সহিত ক্ষিতিজাতীয় তত্ত্বের সংযোগ পাইলেই, স্থূলদেহে পরিণত হয়। কাজেই ঐ সূক্ষ্ম চিদ্বিম্বকেই গুহ্য তেজের তৃতীয় পর্য্যায় বলা হয়। ঐ তৃতীয় শক্তিই যখন আধারে সন্নিবেশিত হয়, তখন উহা চতুর্থ পর্য্যায়ের মনুর প্রজা রূপে পরিগণিত হয়। ঐ প্রজাবর্গই গুহ্য তেজের জ্যোতি, গতি শব্দ সমদ্ভূত। আকাশের প্রত্যেক পরমাণুতে তাঁহার অনন্ত শক্তিময় চৈতন্য গুহ্যভাবে আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এই শক্তিকেই বস্তুর অন্তর্নিহিত তড়িৎশক্তি কহেন। উহা প্রত্যেক অণু, পরমাণু, কণিকা ইত্যাদি, এমন কি পার্থিব সামান্য বালুকাকণায় ও গুহ্যভাবে অবস্থিত। কিন্তু বিশেষ বিশেষ বস্তুর সংযোগ ব্যতীত ঐ তড়িতশক্তির বাহ্য বিকাশ হয় না। এই মত হিন্দু বৈজ্ঞানিকও পোষণ করিয়াছেন। তাঁহারাও বলেন, প্রত্যেক বস্তুর ভিতর অন্তর্নিহিত চৈতন্য শক্তি গুহ্যভাবে আছে। কিন্তু অন্তর্জগতের নিয়মানুযায়ী বস্তুর ক্রমিক সংস্কার ও বিশেষ বিশেষ সংযোগ ব্যতীত এই চৈতন্যের বিকাশ হয় না। জড়জগতে পরমাণুসংযোগে দৃশ্যবস্তু সংঘটিত হয়, এবং তাহার অন্তরস্থ গতি তাপ আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি বিকশিত হয়। ঐ গতি ও তাপ প্রভৃতিতে অন্তর্নিহিত চিচ্ছক্তি বা চিদগ্নি নিবাস করে। বিশেষ বিশেষ বস্তুর

সংযোগে উহাই প্রধূমিত হইতে থাকে। তাহা হইতে বস্তুর উষ্ণতার ন্যায় বাহির চৈতন্য ও ক্রমশঃ বিকাশ হয়। জড়বস্তু হইতে প্রথমে উষ্ণতা, পরে বাষ্পের বিকাশ হয়। উহারই অভ্যন্তরস্থ তেজ অন্তরে যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই বস্তুভেদ করিয়া উহার বিকাশ হয়। ঐ বিকশিত তেজই, জড় হইতে জীব, জীব হইতে মানবাত্মায় চৈতন্যশক্তিরূপে বিকাশ হয়। প্রত্যেক চিদ্বিজ এক একটি পৃথক্ পৃথক্ মনুবুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মাস্বরূপ। ইহা হইতে বুঝা যায়, সামান্য অণু, পরমাণু, কণিকা হইতে কাহারও কখন ধ্বংস হয় না। কেবল অবস্থাভেদে রূপান্তর মাত্র হয়। আরও প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত এক একটী সূক্ষ্ম আদর্শ থাকে, তাহা কখনই কোন অবস্থাতে ধ্বংস হয় না। স্থূল বস্তুর গঠণ ভঙ্গ হইলে, তাহার ঐ সূক্ষ্ম আদর্শ সূক্ষ্ম কারণে অঙ্কিত থাকে। ঐ কারণ মধ্যস্থিত পুরুষশ্রেষ্ঠকেই মহাদেব বলা যায়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে সংকর্ষণ-শক্তির দ্বারা সমষ্টি পরম চৈতন্যের ভাব ব্যষ্টিতে বিকীরিত হয়। সেই সংকর্ষণ-শক্তিই, আবার সমষ্টি অণু পরমাণু ও জীবাণু গ্রথিত, স্থূল দেহকে ক্রমশঃ সংকর্ষিত করিয়া, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আনয়ন করেন। এই কার্য্য-শক্তির যিনি সত্তা, হিন্দুশাস্ত্র তাঁহাকেই মহাদেব বলেন। ইনি ব্যক্ত জগতের প্রথম পর্য্যায়ে ষড়ৈশ্বর্য্যে বিভূষিতা মহা মহিমময়ী পরমশক্তিতে সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত, তাই হিন্দুশাস্ত্র স্থূল জগতে স্থূল দেহ ধরিয়া, সর্ব্বদেবতার অগ্রে ইঁহারই পূজা

সংসারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। বিজ্ঞানের কারণ (ইথর) মধ্যস্থ গুহ্য তড়িৎরূপী চিৎশক্তি, ও তন্ত্রের গৌরীপট্ট সংবেষ্টিত শিবলিঙ্গ একই সত্তা। স্থূল কারণ, স্থূল জগতের মূল, স্থূল কারণে স্থূল জগৎ বিকশিত। ইহার ত্রি-আত্ম বা ত্রি-তত্ত্বে স্থূলের সমুদয় বিকাশ। পৃথিবীর ভূত পদার্থ উহা হইতেই বিকশিত, ও উহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সে কারণ উহাকে ভূতনাথ বলা হয়। আকাশ সমুদয় ভূতের আদি কারণ, আকাশেই সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র অবস্থিত আছে। আকাশস্থ ঐ পঞ্চ তন্মাত্র বা পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পরমাণু হইতেই, স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি। তাই শিবের নাম ভূতনাথ। পঞ্চ তন্মাত্রই পঞ্চমুখ নামে খ্যাত।

বাক্‌পর্য্যায়ের চতুর্থ বৈখরী শব্দই মানবের বর্ণসংযুক্তা ভাষা। ইহা স্থূল জগতের সম্পত্তি বলিয়া, ইহা স্থূল। অপরাপর পর্য্যায়ের শব্দ অপেক্ষা স্পষ্ট ও বর্ণ সংযুক্ত, তাই ইহার শব্দ ডমরু নামে খ্যাত। ডমরুর শব্দে সমুদয় ভূত নৃত্যরত, স্থূল ভূত স্থূল শব্দে স্পন্দিত। তাই ডমরু বাদনে ভূতকূল নৃত্যশীল। স্থূল বস্তুর নিত্য ক্ষয় বা রূপান্তর, যাহার ক্ষয় ও রূপান্তর নিত্যসঙ্গী, শ্মশান বা চতুর্থাবস্থাই তাহার বাসভূমি। অর্থাৎ যাহা হইতে একবস্তু নিত্য অন্যতে পরিবর্ত্তিত হয় তাহাই শ্মশান। শিব চতুর্থ জড়াকাশে অবস্থান করেন বলিয়া, শিবকে তাই শ্মশানবাসী বলা হয়। জড়জগতে জড়াধার যখন, একে একে জড়াকাশে তাহাদের সূক্ষ্ম আদর্শকে বিলীন করিয়া, জড়জগৎ হইতে অদৃশ্য হয়,

তখন ঐ পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রে পরিণত হইয়া, মহাভূতরূপ আকাশে বিলীন হয়। আবার ঐ আকাশ শেষে তাহার কারণে গিয়া যখন সম্মিলিত হয়, তখন ঐ কারণ ব্যতীত আর কিছুই বর্ত্তমান থাকে না, তাই শিব তখন শিবে বা একমাত্র সত্তায় পর্য্যবসিত।

জড়াকাশের কার্য্যশক্তি, সম ও বিষম দুই প্রবাহে প্রধাহিত। দুই প্রবাহেই সমুদয় বস্তু সংগঠিত। ইহাই জড়ে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, এবং জীবে অনুরাগ ও বিরাগ নামে কল্পিত। দুই প্রবাহের সমতা, অর্থাৎ সমান ভাব বা যাহার যাহা গুণ তাহা ব্যতীত, কখন কোন বস্তু নিজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। শিবের জড়াকাশের মহা শক্তিতে এই দুই প্রবাহ বর্ত্তমান। স্থূলাধারে এক প্রবাহ রুদ্ধ হইলে, তাহা কখনই কার্য্যপদে স্থির থাকিতে পারে না, অধিকন্তু ক্ষয়মুখে নিপতিত হয়। সেইজন্য যাহাতে দুই প্রবাহ সমভাবে, অর্থাৎ যাহার যাহা ভাব, তাই লইয়া প্রবাহিত হয় এবং দেহকে বা আধারকে স্থিতি পদে স্থাপিত করে, তাহার জন্যই কঠিন ক্ষয় নিবারণের উপায় স্বরূপ সুধীগণ শিব আরাধনার যুক্তি দান করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও ইহা অনুমোদনীয়। তাঁহারাও বুঝিয়াছেন— যে তড়িৎ বজ্ররূপে জীবের জীবন-হারী, তাহাই আবার জীবের জীবনরক্ষক বা রোগনাশক। জীবদেহে তাহার দুই প্রবাহ সমভাবে চালিত করিলে, জীবের সর্ব্বরোগ নাশ হয় ও গ্রহ নক্ষত্রাদিও স্থিতি পদে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আজিও হিন্দুগণ তাই দুরারোগ্য ব্যাধি নিবারণের ও স্বভাবের স্বভাবশক্তির প্রসরতা

বৃদ্ধির জন্য, শিবের আরাধনা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে শিব বিশ্বের আত্মজ্ঞান বলিয়া, সর্ব্বাবস্থাতেই আরাধ্য।

মহাকারণ ক্রমে ক্রমে জড়াকাশে আসিয়া, তাহার সৃষ্টি-পর্য্যায়ে সংযত, অর্থাৎ মহাকারণ স্থূল জগতের স্থূলপর্য্যায়ে আসিয়া, তাহার কারণত্ব পরিহার করিয়া, কার্য্যতত্ত্বে বিকশিত। কারণ এই পর্য্যায়েই কার্য্যশক্তিতে আবৃত, অথবা চিদাকাশ জড়াকাশে আবরিত। কেন না সৃষ্টপর্য্যায়, চারি পর্য্যায়েই ব্যবস্থিত। এজন্য, শিবের নাম ব্যোমকেশ, অর্থাৎ আকাশীয় প্রবাহরূপ কারণ তাঁহার জটাস্বরূপ। গঙ্গারূপিণী কারণশক্তি যাহাতে আবদ্ধ হইয়া স্থূল সৃষ্টিবিকাশের কারণ হন। পুরাণে তাই কথিত আছে, গঙ্গা মানসপুত্র ভগীরথ কর্ত্তৃক, আহুতা হইয়া, যখন পৃথিবীতে পার্থিব তত্ত্ব সমূহের বিকাশরূপ উদ্ধারের জন্য উর্দ্ধলোক হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেছিলেন, তখন তিনি শিবের জটায় আবদ্ধ হইয়া, বহুকাল তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

মানসপুত্ররূপ লোকদেবতাদিগের, বহু সাধ্য-সাধনায় তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া, স্থূলজগতে কারণশক্তিস্বরূপে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুরাণের এই কল্পনা, যে বিজ্ঞান মূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদের গূঢ় বিজ্ঞানই, পুরাণরূপে কল্পিত। পুরাণ আকাশরূপ অবকাশকে, শিবের মস্তক বলিয়াছেন। আর তাহাতে প্রবাহিত, কারণপ্রবাহকে তাঁহার জটারূপে কল্পনা করিয়াছেন। এবং তাহার অন্তর্নিহিত বিকশিত,

উত্তাপ বা কামনারূপিণী সাক্ষাৎ কার্য্যশক্তির কারণপ্রবাহকে গঙ্গা, ও অপরকে অর্থাৎ কার্য্যশক্তিকে উমা বলিয়াছেন। উমা ও গঙ্গা উভয়ের জন্ম হিমালয়রূপী উর্দ্ধলোকে, অর্থাৎ উর্দ্ধকেন্দ্রে, তন্মধ্যে একটী ক্ষিতিরূপিণী বিশালস্থূলাধার, অপরটি তাঁহার স্নেহ রূপিণী দ্রবীভূতা মাতৃশক্তি। তাই উভয়েই শিবরূপী, পরমসত্তার ভার্য্যাপদে প্রতিষ্ঠিতা। স্থূলাধারে স্নেহরসের অভাব হইলে, অর্থাৎ ক্ষেত্রে তাহার ঔপাদানিক রসের অভাব হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিচাতুর্য্য স্থিতিলাভ করিতে পারে না। কাজে কাজেই ব্যক্ত সৃষ্টির সমুদয় সুখ ঐশ্বর্য্য নিমিষে লয়প্রাপ্ত হয়। তাই স্থূলজগৎ বিকশিত হইলে পর, তাহাতে গঙ্গারূপিণী কারণ বা ঔপাদানিক রস সঞ্চয়নের প্রয়োজন হয়, সে জন্য লোকদেবতা মানসপুত্রগণ, যাঁহারা ব্রহ্মার সহকারী পদে বরিত হইয়া, লোকসমূহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পৃথিবীর ন্যায় স্থূলজগতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাকে স্থিতি পদে স্থাপিত করিবার জন্য, স্নেহরসের বা তাহার জীবনী-শক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পৃথিবী স্থূল, তাহার ক্ষিতি-তত্ত্বের রসও স্থূল, এজন্য পৃথিবীর পরিপোষনের জন্য যে রসের প্রয়োজন, তাহা জলরূপেই কল্পিত হইয়াছিল। ক্ষিতির আভ্যন্তরীণ রসসঞ্চয়ের জন্য ভগীরথরূপ মানসপুত্র গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ণের জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর বাহিরে সপ্তসমুদ্র বর্ত্তমান, আবার অভ্যন্তরে সপ্ততত্ত্বে সপ্তরস বহমান। পৃথিবীস্থ ক্ষেত্র ক্ষিতিজাতীয়া, সুতরাং

ক্ষেত্রস্বরূপ, তন্মধ্যস্থ জল বা জীবনীশক্তি তাহার ঔপাদানিক রস-স্বরূপ। এই দুই তত্ত্ব একত্র হইলে, তবে তাহাতে মাতৃশক্তির বিকাশ হয়। দুই তত্ত্বই শিবের দুই পত্নী, এই উভয়ের সহিত পরম চিদাভাস সংযুক্ত হইলে, তবে স্থূল সৃষ্টি বিকশিত হয়। তাই শিবরূপী পরম সত্তাই, তঁহোদের পতিপদে বরণীয়। ইহাই, জড়-জগতে কারণ, কার্য্য, ও আধার পদে প্রতিষ্ঠিত। এবং স্থূলদেহে বায়ু, পিত্ত, কফ ও অন্তর জগতে মন, বুদ্ধি, ও প্রাণ নামে অভিহিত।

সৃষ্টি, চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্য্যায়ে জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, অথবা শব্দ গতি ও জ্যোতি সমন্বিত ঈশ্বর বা কারণাব্ধি-শায়ী প্রথম পুরুষ বর্ত্তমান। দ্বিতীয়ে সত্ব, রজ, তম, অথবা সূক্ষ্ম দ্রবীয় তত্ত্ব, সূক্ষ্ম তৈজসতত্ত্ব, ও সূক্ষ্ম পার্থিব তত্ত্ব সমন্বিত সৃষ্টিকারী হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্ব বর্ত্তমান। তৃতীয়ে চন্দ্র, সূর্য্য, ও পৃথিবী অথবা, তেজ, রস, ও ক্ষিতি, ত্রিতত্ত্ব সমন্বিত বিরাট-পুরুষ বিদ্যমান। চতুর্থে অগ্নি, জল, ও পার্থিব অর্থাৎ কঠিন, বায়ব, ও তরল পদার্থসমন্বিত মনুরূপ লোকদেবতা, ও তৎসহ সংকর্ষণ রূপী মহাদেব বর্ত্তমান। সৃষ্টিকে যখন উপর হইতে দেখা যায়, তখন তাহাতে কারণ প্রধান, অর্থাৎ পিতৃশক্তির আধিক্যই দর্শন করা যায়। আর যখন তাহাকে নিম্ন হইতে দর্শন করা যায়, তখন তাহাতে কার্য্য শক্তির প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ এই অবস্থায় সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে, তাহার কার্য্য-পরম্পরা বুঝিতে হয়। সুতরাং সৃষ্টি চতুর্থ পর্য্যায়ে থাকিলে

পর, তাহাতে কারণ অপেক্ষা কার্য্যভাব, অর্থাৎ সত্তা অপেক্ষা শক্তি ভাবই অধিক পরিস্ফুট হয়। কারণরূপ আবার্য্য সত্তা, কার্য্যরূপ আবরণের ভিতর আবরিত হইয়া রহে। তাই সৃষ্টির প্রথমে, যে সত্ত্ব পুরুষভাবে পরিচিত, চতুর্থাবস্থায় তাহাই নারী স্বরূপিণী। বেদের চারিভাগের মধ্যে দুই বিভাগে (অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিতে) সমুদয় বিশ্ববিকাশক শক্তিগণ পুংভাবেই পরিচিত হইয়াছেন। তৃতীয় পর্য্যায়েতেই (অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে) তাঁহার শক্তিরাজ্যের শক্তিসমূহ কতক নারী কতক পুরুষভাবে পরিচিত হইয়াছেন। চতুর্থে (তন্ত্রে) আসিয়া তাহাতে পুংশক্তি নিস্তেজ হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নারীশক্তির অর্থাৎ কারণ অপেক্ষা কার্য্য শক্তির প্রাধান্য সংঘটিত হইয়াছে। বেদ শব্দব্রহ্ম, যাহা হইতে সৃষ্টির পরমনীতি, মহাবিজ্ঞানের মহানতত্ত্ব বিকশিত। যাহার প্রতি সূক্তে সূক্তে স্রষ্টার অপরিসীম আধ্যাত্মিক ও পার্থিব সৃষ্টি বিজ্ঞান একাধারে পরিস্ফুট।

কর্ত্তার কর্ম্মবিজ্ঞানই বেদ। তাঁহার অন্তরস্থ মহাকামের মহাস্পন্দনই বেদাকারে বা শব্দরূপে পরিস্ফুট। তাই, তিনি কালমাহাত্ম্যে, যখন যে ভাবের ভাবুক হইয়াছেন, তাঁহার কামনাও তদ্‌ভাবে বিভাবিত হইয়াছে। কাল মাহাত্ম্যে বেদরূপ পরমবিজ্ঞান ও চারিভাগে বিভক্ত, যথা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ও তন্ত্র। ইহাকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ আত্মা অর্থাৎ অপৌরুষেয় শ্রুতি, বুদ্ধ্যাদিধর্ম্ম বা ব্যবহারিক স্মৃতি, মন অর্থাৎ কল্পনাত্মক পুরাণ, ও দেহ অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক আধার বা তন্ত্র এই চারি

ভাগে ভাগ করিয়াছেন। কাজেই ব্রহ্ম যখন নির্গুণ, সৃষ্টির অতীত, তখন ক্লীব ভাবেই পরিচিত, সৃষ্টাবস্থায় তিনি পুরুষ, জগতের নিমিত্ত পদে মহাবিষ্ণু। দ্বিতীয়ে মহামন, তৃতীয়ে, খণ্ড মানস। খণ্ড মানসে আসিয়া সৎ ও অসৎ (অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য) দুই ভাগে সমানে সমান, তাই পুরাণে দেব ও দেবী উভয় ভাগেই পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ পর্য্যায়ে সেই সত্তা আধারে নিয়মিত। আধার শক্তির লীলাভূমি, কাজেই এই অবস্থায় সৃষ্টনীতি দেহতত্ত্বে পর্য্যবসিত। কারণ সত্তা তখন কার্য্যশক্তিতে লীন। তন্ত্রে সেজন্য স্ত্রী-শক্তির প্রাধান্য। বেদ স্পন্দনাত্মক, স্পন্দন প্রবৃত্তিতে তাহার বিকাশ, আবার স্পন্দন নিবৃত্তিতে তাহার তিরোভাব। তাই বেদোদ্ধারকল্পনা হিন্দুশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। যাহা সনাতন ব্রহ্মের সনাতন ভাব, যাহা নিষ্ক্রিয়ে নিরালম্ব স্মৃতিরূপে অথবা নাম-রূপ বা শুদ্ধ আছেন মাত্র ভাবেতে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই বেদের অপৌরুষের বিভাগ। আর যাহা সগুণে দেশ কাল পাত্র, অবস্থার অধীনতায়, তদুপযোগী হইয়া প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ যেমন শ্রুতি স্মৃতিতে, স্মৃতি আবার পুরাণে, পুরাণ আবার তন্ত্রে পরিণত) তাহাই পৌরুষেয় নামে কল্পিত। কিন্তু বস্তুতঃ সূক্ষ্ম চক্ষে পৌরুষেয় অপৌরুষেয় বলিয়া কোন তত্ত্বই জগতে নাই। জগৎই যখন ব্রহ্মভাবের ভাবুক, আবার ব্রহ্মই যখন জগৎতত্ত্বে ঈশ্বর, তখন তাঁহার সমুদয় বিভাগই অবিনশ্বর ও অপৌরুষের।

তথাপি যৎকালে যেরূপ ভাবে ভাবান্বিত হইয়া জীব সংসারে

আগমন করিবে, তাহার যতটুকু (ধারণসক্ষম) বৃত্তি তৎকালে মস্তিষ্কে বর্ত্তমান থাকিবে, ততটুকু তত্ত্বই সে এই অসীম নীতি হইতে গ্রহণ করিবে। বাকি টুকু সংসারে বর্ত্তমান থাকিলেও, তৎ-কালে তাহাতে, কাহারও,কোন অধিকার থাকে না। যেমন মহা-কাশে অনন্ত কারণ শক্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহার যতটুকুই শক্তি কার্য্যাবস্থায় আইসে, ততটুকু লইয়াই সংসার। সেইরূপ অপৌরুষেয় মহাবেগু (বা জানিবার বিষয়) অনন্ত কারণে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিলেও, দেশ কাল পাত্র অবস্থার গুণে তাহা সমুদয় সংসারের ব্যবহারে আইসে না। এই সকলেতে অপৌরুষেয়কে পৌরষেয়ে আনিয়া সংসারের ব্যবহারার্থ নিয়ো-জিত করিতে হয়। নতুবা বাস্তব পক্ষে কোন তত্ত্বই পৌরুষেয় নহে।বেদেরই দশম মণ্ডল কালগুণে দশ বিধিতে, আবার উহাই দশ সংস্কারে নামিয়া দশ কর্ম্মে অভিব্যক্ত। সেইরূপ অনন্ত কারণের শক্তিসমষ্টি কায়ণে কারণ, ব্রহ্মায় মানসপুত্র, পুরাণে দশ অবতার, তন্ত্রে দশ মহাবিদ্যারূপে প্রতিভাত। কাজেই যাহা শ্রুতি, তাহাই স্মৃতি, তাহাই পুরাণ, তাহাই তন্ত্র। কাহাকেও উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সমুদয়ই মহাবিজ্ঞানের মহান তত্ত্ব। কেবল দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থায় উহা রূপান্তরিত। অন্য প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

এক্ষণে বিশ্বের সেই মহান্ জীবনীশক্তি বা আত্মশক্তিকে নমস্কার করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। যিনি নিত্যকালে অব্যক্ত, খণ্ডকালে ব্যক্ত, যিনি মহাকাশে শব্দ, সূক্ষ্মা-

কাশে গতি, স্থূলাকাশে জ্যোতিরূপে সমুদয় বিশ্বকে নিয়মিত করিতেছেন, ভারতের বৈজ্ঞানিক ঋষিকুলের সহিত, তাঁহার বন্দনা করিয়া ইহা শেষ করা হউক।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
সানো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥
ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি
ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখঃ॥
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥

যে অদ্বিতীয় বর্ণরহিত, অপ্রকাশ্য (অর্থাৎ সংগোপ্য) পরমাত্মা, আপনার অসীম শক্তিজাল বিস্তীর্ণ করিয়া অনন্ত বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার অখণ্ড অনন্ত চিদাভাসে জগতের জন্ম, আবার অন্তকালে যে জ্যোতিতে জগতের সম্মিলন, সেই পরম দেবতা আমাদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

যিনি অগ্নিরূপে পৃথিবীতে, বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে, সূর্য্যরূপে দ্যুলোকে, গ্রহ নক্ষত্ররূপে বিস্তীর্ণ অবকাশে, প্রজাপতিরূপে সূক্ষ্মাকাশে ও ঈশ্বররূপে মহাকাশে অবস্থিত।

তুমি কখন স্ত্রীরূপে, কখন পুরুষরূপে, কখন কুমার ভাবে, কখন কুমারী ভাবে, জগতে, দেখা দাও। কখন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের ন্যায় জীর্ণ দণ্ড হস্তে গমন কর। কখন আবার বিশ্বতোমুখ হইয়া, অর্থাৎ নবভাবে ভাবিত হইয়া জন্ম গ্রহণ কর।

তুমি তড়িদ্‌গর্ভ নিত্য সমুদ্র হইয়া, অনন্ত মহাকাশে পরিব্যাপ্ত, তোমারই জ্যোতিষ্কণা বিশ্বের পর্য্যায়ক্রমে কখন নীল পতঙ্গবৎ প্রতীয়মান, কখন বা হরিদ্রাবর্ণে দীপ্তিশীল, কখন বা লোহিত প্রভায় আলোকিত, কখন বা শুক্লবর্ণে প্রতিভাত। ঋতু সকল তোমাতেই বিকাশ। তুমি অনাদি অনন্তভাবে সমুদয়ের ব্যাপক স্বরূপ রহিয়াছ, তোমাতেই পর্য্যায়ক্রমে সমুদয় লোক তাহার অবস্থানুযায়ী ক্রমে বিকশিত, অর্থাৎ ভূর্লোকে ভূতত্ত্ব, ভুবর্লোকে ভুবস্তত্ত্ব, স্বর্লোকে তেজস্তত্ত্ব, মহালোকে মহতত্ত্ব, জনলোকে জনতত্ত্ব, তপোলোকে তপস্তত্ত্ব, সত্যলোকে সত্যতত্ত্ব, ও তুমি ব্রহ্মভাবে পরমব্রহ্ম। সমুদয় ভুবন তোমাতেই উৎপন্ন, তোমাতেই স্থিত ও শেষে তোমাতেই লয়। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

সমাপ্ত।